বোবা কান্না

– অনামিকা রহমান হাসি

ছোটবেলা থেকেই কিছুটা চঞ্চল স্বভাবের হওয়ায় মা–বাবা আদর করে নাম রেখেছিল হাসি। এসএসসি পাস করার পর পরই এক এনজিও অফিসে চাকরি হয়ে গেল। তারপরই মা–বাবা উচ্চ শিক্ষিত এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। স্বামী এক অফিসের বড় কর্মকর্তা। সুশ্রী, বড় চাকরি, সর্বোপরি মার্জিত স্বভাবের স্বামীকে পেয়ে জগৎ সংসারে সকল মানুষের চেয়ে নিজেকে বেশি সুখী হিসেবে ভাবতে লাগলাম।

এভাবেই চলছিল আমাদের দাম্পত্য সুখের সোনালি দিনগুলো। ইতিমধ্যে দুটি সন্তান জন্ম নিল আমাদের সুখের সংসারে। হাসি, আনন্দের কোলাহল মুখর বসন্তগুলো একে একে অতিবাহিত হওয়ার এক যুগসন্ধিক্ষণে এলো এক প্রলয়ঙ্করী কালবৈশাখীর কালঝড়। সে সময় আমার স্বামীর অফিসের এক সহকর্মীর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ আসায় সবাই মিলে গেলাম কক্সবাজারে। ছিলাম তিন চার দিন। সহকর্মীর পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল আপন ভাইবোনের মতো। সে সুবাদে মিশে গেলাম একান্ত আপনজনের মতো।

আমার এই নির্মল মেলামেশাই হলো জীবনের সবচেয়ে বড় কালো অধ্যায় যা কি না আমি ওই সময় বুঝতে পারিনি। বাড়ি ফিরে আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীর আচরণের পরিবর্তন দেখে ঘাবড়ে গেলাম। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর এক রাতে স্বামী যা বললো, শুনে আমার মাথার ওপর যেন সমস্ত আকাশ ভেঙে পড়লো। কয়েকদিনের চলাফেরা ও আচার–আচরণে তার মনের মণিকোঠায় যে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছিল তা একে একে আমার কাছে প্রকাশিত হলো। আমাকে একটা চরিত্রহীন, নষ্টা মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত করে আমার সঙ্গে নোংরামি শুরু করলো। উঠতে বসতে অহেতুক আমাকে যন্ত্রণার বিষবাক্যে জর্জরিত করতে লাগলো। এমনকি আমার প্রতি আপনজন মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজনদের কাছে আমার দীর্ঘ দিনের লালিত চরিত্র সম্পদকে কলঙ্কময়, এক বীভৎস ছবি হিসেবে চিত্রিত করতেও কুণ্ঠা বোধ করলো না।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এরপর থেকে বাড়িতে কোনো আত্মীয়–স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশী, কোনো পুরুষ লোকের সঙ্গে কথা বললে বা তাদের দিকে তাকালেও আমার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করলো। সব কিছু বুঝে চোখে অন্ধকার দেখলাম। ভাবলাম, যে স্বামীকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে মন–প্রাণ, দেহ উজাড় করে দিয়েছি, যাকে ছাড়া একটি রাতের জন্যও স্বস্তিতে ঘুমোতে পারি না, যার সুখই ছিল আমার সুখ, যার শান্তিই ছিল আমার পরম কাম্য আর সেই স্বামী কি না আজ আমাকে চরিত্রহীন ভাবলো?

হায়রে পুরুষ!

হায়রে সুখ!

এভাবে বিভিন্ন ছলছুতোয় আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুললো যা কি না সে কোনোদিনই করেনি, যা ছিল আমার কাছেও অচিন্তনীয়। সন্দেহের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হতে হতে এক সময় নিজেকে খুব

অসহায় মনে হলো। মনে হলো এ অনন্ত বিশ্বে আপনার বলতে আর কেউ আমার নেই। ভাবলাম বেচে থেকে লাভ কি? এর চেয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয়।

এ সকল এলোমেলো ভাবনা ও যন্ত্রণার তীব্র দহনে যখন দগ্ধ হচ্ছিলাম তখন একদিন আমার অফিসের এক কলিগ যাকে খুব বিশ্বাস করতাম, যার কাছে কিছুটা নিরাপদ বোধ করতাম, যার ছিল বিশাল ব্যক্তিত্ব বোধ, প্রগতিশীল চিন্তা, সেই পাচ ছয় বছরের সিনিয়র বড়ভাই একদিন একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসি, তোমার কি হয়েছে? তোমাকে বেশ কিছুদিন থেকে বিমর্ষ লাগছে কেন?

হঠাৎ তার কথায় চমকে উঠলাম। ভাবলাম তাহলে কি ধরা পড়ে গেলাম? ভেবেছিলাম আমার এ বেদনার কথা দুনিয়ার কাউকে জানতে দেবো না। তাই চটজলদি উত্তর দিলাম, কই? না তো! তেমন কিছু হয়নি। এই একটু শরীর খারাপ, বলেই ভীষণ কষ্ট পেলাম। কারণ তার চরিত্রের প্রতি ছিলাম শ্রদ্ধাশীল। তাই তার কাছে মিথ্যা বলায় হঠাৎ নিজের অজান্তেই নিজ অবয়ব পাল্টে গেল। পরে তাকিয়ে দেখি সে আমার উত্তরে সন্তুষ্ট নয়। তার চোখে মুখে তখনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমি আর প্রতারণা করতে পারলাম না। এক সময় পরম নির্ভরশীলতায় তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। জানালাম আমার সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জীবন যন্ত্রণার করুণ ইতিহাস।

তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার অশ্রু সজল চোখ দুটো মুছে দিয়ে পাশের চেয়ারে বসালেন। আমার মানসিক নিপীড়নের কাহিনী জানার এক পর্যায়ে দেখি তার চোখেও জল। তখন হঠাৎই মনে পড়ে গেল সেই গানের কলিটি, *আমি তো আমার গল্প বলেছি, তুমি কেন কাদলে?*

সে থেকেই আমরা একে অপরকে অনেক কাছাকাছি হলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। ধৈর্য ধরে সব কিছু সহ্য করে যেতে বললেন এবং এও বললেন, হাসি, যদি সত্যিই তুমি কোনো অন্যায় না করে থাকো তাহলে একদিন না একদিন তোমার স্বামীর ভুল ভাঙবেই। তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে দেখে আসছি, তোমার মতো স্ত্রী যার হাজার হাজার সৌভাগ্য তার। ঝোকের মাথায় কোনো খারাপ সিদ্ধান্ত নিও না। মনে রেখো, আত্মহত্যা মহাপাপ।

ওনার কথা ও সান্ত্বনার প্রেক্ষিতে অনেকটা হালকা হলাম। নিজেকে আবার সত্যের মুখোমুখি দাড় করানোর সাহস খুজে পেলাম। এভাবে আস্তে আস্তে তার প্রতি, বলতে দ্বিধা নেই, কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লাম। মনে মনে তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু সমাজ সংসার সব কিছু মাথায় রেখে মুখ ফুটে তাকে বললাম না। হয়তো তিনিও আমাকে গভীরভাবে বুঝতে পারলেন, মুখে কিছু বললেন না।

কোনো এক মাসের ২৮ তারিখে তিনি চিঠির মাধ্যমে জানালেন তার ভালোবাসার কথা। যা ছিল নির্মল, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম এক পবিত্র ভালোবাসার আহ্বান। যে আহ্বানের মধ্যে ছিল না দেহের চাহিদা মেটানোর আকাঙ্ক্ষা, ছিল মানসিক যন্ত্রণা নিবারণের এক শপথ। আমিও কথা দিলাম তাকে আমৃত্যু ভালোবাসার পূত-পবিত্র শক্ত শেকলের শ্রদ্ধাশীলতার অটুট বাধনে।

সে সময় বাংলা নববর্ষের আগে একদিন দেখি তিনি অফিসের গেটে আমার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন। কারণ আমরা একই বাসে চড়ে বাসায় ফিরি। কাছে আসতেই আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, আগামী বৈশাখী মেলায় এটা পরে এলে খুশি হবো।

খুলে দেখি একটা মাঝারি দামের সুন্দর শাড়ি। দেখে চমকে উঠি। মনে পড়ে বাসায় স্বামীর কথা। সে যদি কখনা জানতে পারে এটা অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া নববর্ষের উপহার তাহলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেবে। তবুও নিলাম, ভাবলাম, যে আমাকে দৈহিকভাবে নয়, আন্তরিকভাবে ভালোবাসে তার দেয়া উপহারকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। আরো মনে পড়লো, বেশ কিছুদিন আগে তার দেয়া অন্য একটা জিনিসের কথা যা আমি না নেয়ায় রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে আমারই সামনে সে জিনিস তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাই আর আপত্তি না করে ব্যাগে ভরে বাসায় নিয়ে রাখলাম।

পহেলা বৈশাখ শাড়িটি পরে বৈশাখী মেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু কি ভেবে পরক্ষণেই তা খুলে রেখে অন্য একটা পুরনো শাড়ি পরে কিছু হালকা গহনা গায়ে বাসা থেকে বের হলাম। বাসে তার সঙ্গে দেখা হলো। আলাপের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শাড়িটা পরোনি কেন? তার প্রশ্নে সব কিছু খেই হারিয়ে ফেললাম। শেষে এক সময় বললাম, পরেছিলাম, খুলে রেখে এসেছি।

কেন?

তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না। তিনিও আর কথা বাড়ালেন না।

যথারীতি মেলা থেকে ঘুরে এসে কয়েকদিন পর অফিসে গিয়ে জানলাম তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা গিয়েছেন। সাত আট দিন পর পিয়ন এসে দুইটা খাম দিল। একটাতে তার সিলেটে বদলির আদেশ, অন্যটি আমার উদ্দেশে লেখা।

হাসি,

যৌবনে কাউকে ভালোবাসার সুযোগ আসেনি। জীবনের মাঝখানে এসে তোমার সঙ্গে পরিচয়, সহকর্মী থেকে হতে চেয়েছিলাম সহমর্মী। তাই মনের অজান্তে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তবে সে ভালোবাসা ছিল একান্তই আন্তরিকতার শক্ত সুতোয় বাধা, যেখানে ছিল না নোংরামির কোনো লেশমাত্র অকিঞ্চন যে ভালোবাসার ছিল না কোনো সার্থক পরিণতি, ছিল না চাওয়া–পাওয়ার কোনো হিসাব–নিকাশ। তা সত্ত্বেও আমি হেরে গেলাম। বুঝতে পারলাম জীবনে কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসতে নেই, ভালোবাসা অপরাধ। যারা ভালোবাসার মানুষকে দেয়া ক্ষুদ্র উপহারটুকু ভয়ে, সঙ্কোচহীন চিত্তে ব্যবহার করতে পারে না, যাদের কাছে রূপার চেয়ে সোনার মূল্য ভালোবাসার চেয়েও অধিক দামি, যারা প্রিয়জনের ক্ষুদ্র আবদারটুকু রক্ষা করার সৎ সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকে পলে পলে, ক্ষণে ক্ষণে ভালোবাসার চেয়ে দূরে সরে যাওয়াই শ্রেয়। তাই কাউকে না জানিয়ে তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম। দুঃখ নিও না। আশীর্বাদ করি স্বামী সন্তানদের নিয়ে সুখে থেকো। ভুলে যেও তোমার জীবনের ধূমকেতুসম আবির্ভূত এ পাগল মানুষটাকে।

ইতি – ভাই

বর্তমানে আমার স্বামীর মনের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। তাকে নিয়েই কাটাতে হবে আমার বাকি জীবন। হয়তো একদিন তার কথা মতোই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনের মাঝপথে এসে যে ভালোবাসার নির্মল স্পর্শে অবগাহন করে ধন্য হয়েছিলাম, যে ভালোবাসার পরশ পাথরের ছোয়ায়

নিজেকে আবার বাচিয়ে তুললাম তা কি না একটি মাত্র শাড়ির কারণে আমার জীবন থেকে নির্বাসিত হলো!

তাই সেদিন থেকে কোনো নববর্ষেই আমি আর শাড়ি পরতে পারি না। পহেলা বৈশাখ এলেই বাক্স থেকে তার দেয়া শাড়িখানা বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসাই। কেউ জানে না, কেউই শোনে না আমার সেই বোবা কান্নার নির্মম যন্ত্রণার চাপা আর্তনাদ।

রাজশাহী থেকে

দুর্গম পাহাড়ে

– ডালিয়া নিলুফার

শাড়ি আমার খুব ভালো লাগে। শাড়িতে মেয়েদের যে কমনীয়তা, সৌন্দর্য, যে পরিমাণ নারীত্ব, সম্ভ্রম ও আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়, আমার মনে হয় বাঙালি মেয়েদের অন্য কোনো পোশাকে তা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ সময় বিদেশে কাটানোর ফলে বাধ্য হয়ে অন্য পোশাক পরেছি। কিন্তু সপ্তাহে এক দুই দিন শাড়ি না পরলে মনে হতো আমার কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শাড়ি পরে আমার পরিচয়, আমার আত্মবিশ্বাস নতুন করে ফিরে পেতাম। বিদেশি বান্ধবীদের শাড়িতে উৎসাহিত করা, শাড়ি সম্বন্ধে নানান রকম প্রশ্নের উত্তর দেয়া, সহজ উপায়ে শাড়ি পরার পদ্ধতি তাদের শিখিয়ে দিতে পারলে আমার মনটা এক অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে যেতো।

ছোটবেলা থেকে নাচ–গান, পড়াশোনা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকতে হতো যে, সেলাই–ফোড়ের সময় পেতাম না। বিয়ের সময় এক সঙ্গে এতোগুলো শাড়ি পাবার পরও শখ হলো নিজের শাড়িতে এমব্রয়ডারি করার! দুটো সুতির শাড়িতে সুন্দর ফুলের ঝাড় মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলতাম। দুর্ভাগ্য! ইসলামাবাদ থেকে প্রাণ নিয়ে পালানোর পথে প্রথমে পাকিস্তান, পরে আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড় এলাকা পার হবার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আজো মনে পড়ে। প্রাইভেট কার, ট্রাক্টর, ট্রাক, কতো রকমের বাহনে যাত্রা। উর্দুভাষী ও পশতুভাষী মানুষের সাহায্য নেয়া। পাহাড়ি এলাকার মানুষের খাবার শেয়ার করে খাওয়া। এসব কষ্ট তো ছিলই। তার উপরে ছিল প্রাণ হারানোর ঝুকি। কিন্তু এতো সব দুঃখ–কষ্ট, ভয়–ভাবনার মধ্যেও ইসলামাবাদে ওই দুটি শাড়ি ফেলে আসার কথা অন্য সব কিছু জিনিসপত্র হারানোর চেয়ে অনেক বেশি মনে পড়ছিল।

আমার সেই বিশেষ শাড়ি দুটো হারানোর দুঃখে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। শাড়ির এতোই মাহাত্ম!

কুয়েনরিয়ান, ক্যানবেরা থেকে

আটককৃত

– এ এফ কাঞ্চন বাহাদুর

১৯৯৩ সাল। আমি তখন হাই স্কুলের শীর্ষ শ্রেণীর ছাত্র। আব্বা তখন থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। সে কারণে আমাদের তখনকার এমপি, সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহম্মদউল্লাহ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে

আটককৃত ভারতীয় শাড়ি থেকে প্রায় দুই হাজার পাচশ পিস শাড়ি আব্বার হাতে তুলে দেন ঈদ উপলক্ষে গরিব নারীদের মাঝে বিতরণের জন্য।

নিজ নিজ এলাকার মানুষের এবং নিজেদের অংশ বুঝে নিতে আমাদের বাড়িতে তখন থানা বিএনপির নেতা-কর্মীদের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। সে সঙ্গে রিকশাচালক এবং দিনমজুররাও ভিড় করতে থাকে। এদের কেউ শাড়ি পেয়ে খুশিতে আবার কেউ শাড়ি না পেয়ে মুখ কালো করে বাড়ি ত্যাগ করছে। দুই হাজার পাচশ পিস শাড়ি থেকে আম্মা প্রায় ষাট পিস শাড়ি বেছে নিয়েছেন কাছের আত্মীয়দের দেয়ার জন্য। এদের অধিকাংশই এসব শাড়ির দাবিদার হওয়ার যোগ্য ছিল না। তারপরও দিচ্ছেন। কারণ আমার বাবার পক্ষে কখনো আত্মীয়স্বজন সকলকে শাড়ি দেয়া সম্ভব হয়নি।

এখন সকলকে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আম্মা তা কাজে লাগাচ্ছেন। শাড়ি পেয়ে সকল আত্মীয়ই খুশি হয়েছেন। এদের মাঝে আমার দূরসম্পর্কের এক আপা শাড়ি পছন্দ না হওয়ায় এবং আর একটা অতিরিক্ত চেয়ে না পেয়ে তাকে দেয়া শাড়িটি অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছেন। অনেক মন্দ কথা বলেছেন শাড়ির সঠিক মালিকদের ষাট পিস শাড়ি থেকে বঞ্চিত করায়। অথচ তিনিই দুটো চেয়েছেন। আবার এক আন্টির অনেক দিন আমাদের ঘরে আসেন না, কথা বলেন না। অথচ এতো শাড়ি দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে আমাদের ঘরে এসেই নিজের পছন্দমতো তিনটে শাড়ি বেছে নেন। বাবা, মা কিছুই বলেননি। যদি এর ফলে সম্পর্কটা জোড়া লেগে যায়, তাহলেই হয়।

এতোগুলো শাড়ি আত্মীয়স্বজন ও পার্শ্ববর্তীদের মাঝে বিতরণ করেও বাবা প্রশংসা কুড়াতে পারেননি। দ্বিতীয়বার ১৯৯৪ সালে এক ঈদে প্রায় দুই হাজার পিস আটককৃত ভারতীয় শাড়ি আব্বা ঢাকা থেকে নিয়ে আসেন। এবার আমার কথামতো একটা শাড়িও কোনো আত্মীয়কে আব্বা দেননি। সবগুলো দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করেন। এরপরও *যে লাউ সে কদু*। সে থেকে আর বড় মাপের শাড়ির লট বাবা আনেননি। কারণ পরিশ্রম করে মন্দ কথা শোনার যুক্তি নেই। তারপরও দরিদ্র মহিলাদের কথা চিন্তা করে বাবাকে বলেছি এমপির মাধ্যমে আগামী ঈদে আবার আটককৃত ভারতীয় শাড়ি আনার জন্য।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

ব্যর্থ মানচিত্র

– মনোহর আহমেদ

১৯৯৮-এর মার্চ এপ্রিলের ঘটনা। একদিন অফিসে গেলেই বয় খামের উপর আমার ঠিকানা লেখা একটি চিঠি দিল। অতি আগ্রহে চিঠিটি খুলে দেখি আমার সেই শ্যালিকার যার নাম তানিয়া। স্ত্রীর মামাতো বোন। শ্বশুরালয় এবং মামাশ্বশুরের বাসা পাশাপাশি। তাই তাদের বাসায় শ্বশুরালয় গেলেই ওদের বাসায় যাওয়া হতো। স্ত্রীর বেশ কয়েক বছরের ছোট। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খোলামেলা বন্ধুর মতো। তারপরও আমার স্ত্রীর অন্তরালে এবং অন্যদের অগোচরে সর্বদাই আমার কাছে সে কি যেন বলতে চেয়েও পারছে না। আজ চিঠি খুলেই হৃদয়ঙ্গম করলাম তার মনের কথা।

এ যেন রীতিমতো প্রেমপত্র। আমি বিবাহিত। তথাপি তার কাছে নাকি এটা কিছুই না। শুধু আমি চাইলেই সে আমার জন্য সব কিছুই করবে। তার ফিগার, গায়ের রঙ, চেহারায় সে ছিল অপরূপ। আমি জেনেশুনেও কেন জানি তার চিঠির উত্তর দিলাম তার দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী।

এমনিভাবে চিঠিপত্র দেয়া–নেয়ার কিছুদিন পর তার এইচএসসি পাসের পর পরই বিয়ের প্রস্তাব এলো। সুন্দরী শিক্ষিতা মফস্বল শহরের পাত্রীর প্রথম প্রস্তাবেই পছন্দ এবং বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের আগে আমাকে তার অনেক অনুনয় ভরা চিঠি দিয়েও যখন আমার কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পায়নি তখন রাগে, অভিমানে স্বামীকে নিয়ে সংসার পেতে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। এদিকে আমিও দীর্ঘ দিন যাবৎ বিবাহিত জীবনযাপন করেও কোনো সন্তানের পিতা হতে পারিনি বিধায় স্ত্রী ছাড়া যখনই তার কথা মনে পড়তো তখনই নানান চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম।

তার বিয়ের তিন বছর পর তার এক পুত্র সন্তানসহ বাপের বাসায় অবস্থানরত সময়ে আমিও কি এক বিশেষ কাজে একাকী শ্বশুরবাড়ি তথা তাদের বাসায় গেলাম। বহুদিন পর যখন তাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করলাম তার উছলে পড়া রূপের আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কেমন যেন হয়ে গেলাম।

বিয়ের আগে হ্যাংলা পাতলা তরুণীটি এখন যেন পরিপূর্ণ অবয়বে স্বাস্থ্যবতী এক অপরূপ নারী। যার শরীরের প্রতিটি অঙ্গই যেন যে কোনো পুরুষকে গিলে খেতে চায়। বাসার সবার সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর আমি তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল আমি যেন এক চরম ভুলের শিকার। চিঠিতে তার প্রেম নিবেদন এবং গোপনে বিয়ের তাড়নায় সে যখন আমায় লিখতো তখন তার কথায় কেন সাড়া দিইনি! কেন তখন স্ত্রীকে উপেক্ষা করে তাকে বিয়ে করিনি। তখন যদি তাকে বিয়ে করতাম তাহলে আজকে তার কোলে যে সুন্দর বাচ্চাটি তার পিতা হয়তো আমিই হতে পারতাম। তবুও নিজেকে অনেক সামলে নিয়ে বললাম, তুমি তো এখন আরো দারুণ সুন্দর হয়েছো!

তার আরো দুই তিন ঘণ্টা পর রাতের খাবার শেষে নিরিবিলি এক রুমে বসে একান্তে তার সঙ্গে আমার দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা বললাম এবং তার দাম্পত্য জীবনের কথাও শুনলাম।

কথা বলার এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ চলে গেল। অন্ধকারে সে যখন আমার উরুর ওপর বসে হারিকেন খোজার চেষ্টা করছিল তখন তার শাড়ির প্যাচে ব্লাউজের রাউন্ড কাটিংয়ের উদাম অংশের নরম মাংসে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় আমার দুই গালে দুই হাতে চাপের পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

অন্ধকার রুমের দিকে কেউ আসছে কি না দরজার পাশ থেকে উকি দিয়ে পুনরায় আমি খাটে বসা অবস্থায় আমার পাশে ঘেষে দাড়ালো। তার স্তনটি যখন আমার মুখমণ্ডলে চেপে ধরলো, আমি যেন মুহূর্তেই তার দেহের সঙ্গে মিশে গেলাম। এভাবে আমার হাত দুটি যখন তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চলছিল সে তখন ফিশ ফিশ করে বলছিল, যে জিনিস নিজের হওয়ার কথা ছিল সে জিনিস অন্যকে দিয়ে এখন অন্যের জিনিস নিয়ে এতো গবেষণা করার শখ কেন মহাশয়।

আর অমনি অন্য রুম থেকে হারিকেনের আলোর রেখা এ রুমে আসতেই আমরা স্বাভাবিক হয়ে বসলাম। কাজের বুয়া হারিকেন দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুমে প্রবেশ করলো শালা। আর ছোট শালী তার পড়ার রুমে। আমরা স্বাভাবিক হয়ে শালাসহ কথা বলার কিছুক্ষণ পর বিদ্যুৎ চলে এলো।

এদিকে রাত গভীর হওয়ায় ডিগ্রির ছাত্র শালার সামনে আমাদের একান্ত আলাপের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দীর্ঘশ্বাস ও হা–হুতাশের এক পর্যায়ে সে পাশের রুমে ঘুমাতে গেল। আমিও শালার সঙ্গে এ রুমেই শুলাম। বাতি নিভালেও আধারে যেন আমার দৃষ্টি কোথায় গিয়ে স্থির হয়ে রইলো। রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাত আনুমানিক তিনটার পর অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম শাড়ি পরিহিতা তানিয়া আমার রুমে পা টিপে টিপে প্রবেশ করছে। সে দুই তিন হাত দূরে থাকতেই পাশের রুম থেকে তার বাচ্চা আম্মু বলে চিৎকার দিতেই ছায়ার মতো দ্রুততায় রুমে ফিরে গেল। যাওয়ার সময় দরজার ক্লিপে লেগে তার শাড়িটি আড়াআড়িভাবে বহুদূরে ছিড়ে গেল। আমি ভালো ঘুমের ভান করছিলাম তখন। আর শুনছিলাম সে তার বাচ্চাকে মুহূর্তেই সামলে নিল এবং পরক্ষণেই পরনের ছেড়া শাড়িটি পাল্টিয়ে অন্য একটি শাড়ি পরে নিল।

ভোর সাড়ে ছটায় যমুনা এক্সপ্রেসে আমার ঢাকায় ফেরার পালা। কাকডাকা ভোরে সে আমায় বিদায় জানাতে অন্য শাড়ি পরিহিত অবস্থায় শালাসহ স্টেশন পর্যন্ত এলো। রওনা হওয়ার আগে বহু অনুরোধ করে তার ছেড়া শাড়িটি দেখে এসেছিলাম। ছেড়া শাড়ির ফাকা অংশটি যেন কোনো কাজের ব্যর্থ চেষ্টার এক বিফল মানচিত্র। এই ছেড়া মানচিত্রে রাতের বিফল ঘটনার আচড় যেন লেগে আছে।

স্টেশনে আসার পাচ মিনিটের মধ্যেই ট্রেন চলে এলো। কথা বলার আর কোনো সুযোগ পেলাম না। রাতে কি উদ্দেশ্যে সে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল তা আর তার মুখ থেকে শুনতে পারিনি। ট্রেনে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে ছেড়ে দিল। জানালার বাইরে মাথা রেখে যতোক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা যায়, দেখছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নারীমূর্তি যখন গাছের আড়ালে ঢাকা পরে গেল তখন মনে হচ্ছিল কেন যে তার সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য এতো সান্নিধ্যে দেখা হলো?

ট্রেন চলার শব্দের তালে তালে তার কথা, হাসি, ব্যর্থতার হুতাশ, উচ্ছল শরীরের অঙ্গভঙ্গি সব মনের আয়নায় প্রত্যক্ষ করছিলাম। নিজেকে বহু অপরাধীর মতো লাগছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল যদি পারতাম তাহলে তার ছেড়া সুতি শাড়ির স্মৃতিকে আগলে রেখে তার বিনিময়ে তাকে নরম সিল্কের শাড়ি পরিয়ে শাড়ির প্যাচে প্যাচে আদরে আদরে তার সর্ব অঙ্গে শিহরণ তুলে দিতাম।

শাড়ি ছেড়ার ঘটনার কিছুদিন পরই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার কোনো এক পর্যায়ে শ্বশুরবাড়ি আর যাবো না বলে যাওয়া হয়নি। এবং শ্বশুরালয়ে গিয়ে মামাশ্বশুর এবং তানিয়ার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তানিয়ার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ সে তো মোটেই সম্ভব নয়। তাই অফিসের কাজের ব্যস্ততার ফাকে এবং সন্তানবিহীন বিশাল সংসারের নীরব মুহূর্তে তানিয়ার শাড়ি ছেড়ার ঘটনাটি হৃদয়ে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

ঢাকা থেকে

নীলাম্বরী ডায়ানা

– আফিয়া আয়েশা

১৯৮১ সালে যখন পৃন্সেস ডায়ানা–র বিয়ে হয়েছিল, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নানান উপহার সামগ্রী পেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছিল একখানা জামদানি শাড়িসহ অন্যান্য উপহার। তখন থেকেই আমার মনে সুপ্ত বাসনা ছিল যদি কখনো পৃন্সেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকে শাড়ি পরতে অনুরোধ জানাবো। কল্পনায় অনেকবার তাকে শাড়ি পরিয়েছি, সব জামদানি।

১৯৯৫ সালের এক দুপুরে একটি কবিতা লিখেছিলাম ডায়ানা–কে নিয়ে। সেখানে লিখেছিলাম–

ডায়ানা আমার বহু দিনের শখ তোমাকে
পরাবো শাড়ি। পেয়াজি জামদানি পরা আমাকে
দেখে যখন মুগ্ধ চোখে চাইলে তুমি তখনই
আশা পূরণের সঙ্কেত পেয়ে যাই।

অন্য জায়গায় লিখেছি –

নীলাম্বরী জামদানি তুমি হয়ে গেলে মুহূর্তেই অপ্সরী।

আমার এ বাসনা পূর্ণতা পায়নি। পৃন্সেস ডায়ানা আজ অনেক দূরে। কল্পনা ব্যতীত বাস্তবে তাকে জামদানি পরানো আর সম্ভব নয়। তাই ডায়ানাকে কল্পনাতেই শাড়ি পরাই। অপরূপ এই রূপসী আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।

অপ্রাসঙ্গিক দুটি কথা। বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য জগতে যেমন মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এখন বিশ্বাস করি, একজন মুসলমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই ডায়ানাকে হত্যা করা হয়েছে। এটাই সত্যি।

পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা থেকে

পোস্টকার্ড বনাম খাম

– শর্মী

সামনেই ভাইয়ার বিয়ে। মাত্র এক মাস বাকি। কমিউনিটি সেন্টার বুক করা হয়েছে যার নাম *বিলাস ভবন কমিউনিটি সেন্টার।* আর বিয়ে খালাতো বোন বীথিআপুর সঙ্গে। তাই আনন্দের মাত্রা এক ডিগ্রি বেশি। এরই মধ্যে শাড়ি, গহনা, কসমেটিকস, গিফট ইত্যাদির লিস্ট করা হয়েছে। কিন্তু কেনাকাটা?

আমি মোটামুটি ফৃ। থার্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি বা কয়েকদিন পরেই শুরু হবে। খুব ইচ্ছা বিয়ের শপিং করার। কথা হলো কেনাকাটায় যেই থাক না থাক, ভাইয়ার সঙ্গে আমি থাকবোই। বেইলি রোড থেকে বিয়ের সব শাড়ি কেনা হলো। একটা শাড়ি

খুব পছন্দ হলো আমার। মেরুন কালার, সোনালি পাড়। ভাবলাম বিয়েতে থ্রি পিস না কিনে এ শাড়িটা কিনবো। কখনোই আমি শাড়ি পরিনি। শাড়ি পরে হাটতে পারবো তো? এ চিন্তাও ছিল।
একদিন ভাইয়াকে বললাম শাড়ি পরার কথা। তিনি বললেন, তুই পরবি শাড়ি? জীবনেও তো তোকে শাড়ি পরা দেখিনি।
তিনি বললেন, আগে কয়েকদিন শাড়ি পরে প্র্যাকটিস কর, দেখি হাটাচলা করতে পারিস কি না।
একদিন মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। শাড়ি তখনো কেনা হয়নি।
ভাইয়া বললেন, শাড়ি কিনে দিলে তোর আর পা ব্যথা থাকবে না। এর আগে যতোক্ষণ তোকে হাটাতে পারি!
শাড়ি কেনার পর মনে হলো, শাড়ি যখন কিনেছি পরা তো লাগবেই। আর কেমন যে একটা অনুভূতি, কিছুটাভালো লাগা, কিছুটা ভয়, কিছুটা লজ্জা একীভূত হলো আমার মনের মাঝে।
আজ বিয়ের দিন। ১৯ এপ্রিল শুক্রবার। মনটা কেমন জানি করছে। আমার পছন্দের মানুষের কথা বার বার মনে পড়ছে। ভেবেছি প্রথম যেদিন শাড়ি পরবো, তাকে দেখাবো, শুধুই তাকে। কিন্তু সে সুযোগ কখনো এলো না। ১৯ তারিখের এক মাস আগে তার সঙ্গে শেষ যখন দেখা হলো তার মতামত জানতে চেয়েছি শাড়ি পরার ব্যাপারে।
সে বললো, তোমার ইচ্ছা। আজ এ জন্য মন কিছুটা খারাপ। কতো মানুষ দেখবে, চেনা–অচেনা, অথচ সে দেখবে না।
হঠাৎ সকাল এগারোটায় ফোনটা বেজে উঠলো। তার কণ্ঠ? আমি অবাক। ভেবেছি বরিশাল থেকে ফোন করেছে। কিন্তু সে বললো, আমি ঢাকায়।
বললাম, তুমি এ সময় ঢাকা এসেছো কেন?
সে বললো, তুমিই তো সেদিন বললে ১৯ তারিখে একটু এসো না।
বললাম, আর তুমি চলে এলে? আমি ফোন রাখলাম, বাড়ি ভর্তি মেহমান।
সে জানতে চাইলো, কয়টায় কমিউনিটি সেন্টারে যাবো, কয়টায় আসবো?
বললাম।
সে বললো, ঠিক চারটায় কমিউনিটি সেন্টারের গেটে আসবে।
বললাম, ঠিক আছে, আসবো।
এতোক্ষণে বুঝলাম সুদূর বরিশাল থেকে ঢাকা আসার তাৎপর্য। রেডি হওয়ার সময় প্রথমে ঘড়িটা হাতে পরি। না হলে কখন চারটা বাজবে, আমি জানবো কি করে?
সেন্টারে যাওয়ার পর যখন চারটা বাজলো তখন ভাইয়া অর্থাৎ বরের হাত ধোয়ানো নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আমি এর মধ্যে মামাতো বোন আখিকে নিয়ে গেলাম। দেখলাম, রাস্তার ওপাশে দাড়িয়ে আছে। দুই মিনিট কথা হলো।
তারপর চলে এলাম। প্রিয়াকে প্রথম শাড়ি পরা অবস্থায় দেখলে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমায় প্রেমিকরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর বাস্তবে তো বটেই। কিন্তু আমার বেলায় বিপরীত। খুব নরমাল। মনে হয় আমাকে শাড়ি পরা দেখতেই সে অভ্যস্ত। একবারও বলেনি, তোমাকে সুন্দর লাগছে।

অথচ কি আশ্চর্য! এই এক নজর দেখার জন্য কতো দূর থেকে সে এসেছে। অবশ্য অনেকেই বলেছে, আমাকে খুব সুন্দর লাগছে শাড়িতে। কেউ কেউ বলেছে, পরবর্তী আকর্ষণ। কারণ ভাইয়ার পরে আমি একা বিয়ের বাকি।

আরো একটা ব্যাপার। প্রথম শাড়ি পরায় আমার ভেতর কোনো জড়তা ছিল না। টন টন করে এদিক–সেদিক হেটেছি অনেকের মতো।

ছবি পৃন্ট করার পর বেশি প্রশংসা করেছে খালুজান। বলেছেন, সবার ছবির মধ্যে তোর ছবিই তো সুন্দর হয়েছে। তুই তো ফটো সুন্দরীতে নাম দিতে পারবি।

যে যাই বলুক, আমি তো জানি আমার বাদরের মতো চেহারায় আবার ফটো সুন্দরী? কিন্তু আমার সেই মানুষের সমস্যাটাই এখানে। তোমাকে ভালো লাগে, তোমাকে সুন্দর লাগছে এই জাতীয় কথা সে বলতে পারে না। শুধু এই টাইপের কেন, কোনো রোমান্টিক কথা তার মুখ থেকে বের হবে না। এ পর্যন্ত সে কখনোই বলেনি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অবশ্য এটাই আমার ভালো লাগে। সব ভালোলাগা, ভালোবাসা খামের ভেতর প্রকাশ পায় না। আর যদি প্রকাশ করতো তাহলে তো পোস্টকার্ড হয়ে যেতো। তাহলে খাম পোস্টকার্ডের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কি?

একবার একটা চিঠিতে সে লিখেছিল, আমি খুব ভাগ্যবান যে, তোমার মতো খুব ভালো একটা মেয়ে আমি পেয়েছি। চিঠির চার পাচটা লাইনের পর এ বাক্যটা ছিল। চিঠির বাকি অংশ কেন জানি কিছুক্ষণ পড়তে পারলাম না। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আর চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

এখন আর আমার কোনো আফসোস নেই। কারণ তাকে শাড়ি পরে আমি দেখাতে পেরেছি। হোক না দুই মিনিটের জন্য। এটাই আমার শান্তি।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

ঝড়

– ইংলিশ রিপন

নীলাভাবী এবং আমরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকি। আমাদের অনেক পরে নীলাভাবী তার স্বামীসহ এই বাসায় ভাড়া আসেন। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকার সুবাদে নীলাভাবীর সঙ্গে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক। বিশেষ করে আমার ছোট দুই বোন শামা আর সীমার সঙ্গে। নীলাভাবীর কোনো কাজ না থাকলে তিনি সারাক্ষণ আমার দুই বোনের সঙ্গে গল্প করতেন আমাদের বাসায় এসে।

নিঃসন্তান এই রমণী দেখতে দারুণ সুন্দরী ছিলেন। আকর্ষণীয় চেহারা এবং দুর্দান্ত ফিগারের অধিকারী নীলাভাবী ছিলেন আমার স্বপ্নের নারী। বয়সে আমার চেয়ে পাচ বছরের বড় হওয়ায় এবং আমি ভীষণ লাজুক হওয়ায় তার সঙ্গে আমার তেমন কথা হতো না। অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপও ছিল

আরেকটি কারণ। তবে নীলাভাবীর সঙ্গে আমার দেখা হলে প্রায়ই মুচকি হাসতেন। তার সেই হাসিতে অন্য রকম এক আবেদন ছিল যা আমার ভালোভাবে বুঝতে অসুবিধা হতো না।

একদিন আমার বন্ধুর বোনের বিয়ে উপলক্ষে একটি নীল রঙের শাড়ি কিনে বাসায় আসি। সেদিন আমার বাসায় কেউ ছিল না। বাসায় এসে শাড়ির প্যাকেটটা বিছানায় রেখে গোসল সারতে বাথরুমে ঢুকি। প্রায় পনেরো মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠি। দেখি নীলাভাবী শাড়ির প্যাকেট খুলে অর্ধেক শাড়ি পরে উপুড় হয়ে শাড়ির ভাজ ঠিক করছে।

ব্লাউজ পরা অবস্থায় তার বিশাল বক্ষ দেখে যখন নিজেকে অন্য জগতে নিয়ে ভাবছি তখন অনেকটা সহজ ভঙ্গিতে বললেন, শাড়িটা আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে। এমনিতে আমি নীল রঙের প্রতি দুর্বল। তাই এই শাড়িটা আমি নিয়ে নিলাম। শাড়ির দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।

শাড়িটায় আপনাকে পরীর মতো লাগছে, সুতরাং শাড়িটা আপনি নিয়ে নেন, টাকা লাগবে না। আমি বললাম।

ভাবী বললেন, না না তা কি হয়! তুমি ছাত্র। টাকা পাবে কোথায়? এই বলে ভাবী একটু অন্য রকমভাবে তাকালেন।

তার সেই চাহনিতে ছিল কামনার আগুন।

ঠিক আছে টাকা না নাও । অন্য কিছু নাও। এই বলে আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, তোমার জন্যই এ বাসায় আসি। এতো কাছে থেকে কেন এতো দূরে থাকো? শাড়ির বিনিময়ে আজ তুমি যা চাইবে তাই পাবে। বলে আমার ঠোট চুষতে লাগলেন।

আমিও পাগল হয়ে তাকে চুমু খেতে লাগলাম। চব্বিশ বছরের পৌরুষটা আকাশ ছুতে চাইলো।

তখন বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। সেই ঝড় দুজনকে স্পর্শ করলো। উড়িয়ে নিয়ে গেল। ভাবী আমাকে ইদুরের মতো ব্যবহার করলেন।

যাওয়ার আগে শুধু বলে গেলেন, সময় আর সুযোগ হলে এ রকম সারপ্রাইজ আরো দেবো।

খানপুর, নারায়ণগঞ্জ থেকে

কষ্টের বন্দরে

আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রমাণ করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি মহামানবের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য, সেই মহামানবের যিনি সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিখ্যাত লাইনগুলো আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। মনে হয় আমাকে উৎসর্গ করেই রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি লিখেছেন।

স্কুল থেকেই শিহাবের সঙ্গে আমার পরিচয়। শিহাব আমার দুই বছর সিনিয়র ছিলেন। আস্তে আস্তে ভালোলাগা থেকে আমার ভালোবাসার মানুষে পরিণত হলো শিহাব।

স্কুল–কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আমরা দুজনেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেলাম। আমার জীবনের একান্ত মুহূর্তগুলোকে সে ক্রমেই তখন খুশির হাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে শুরু করে। যতোই সে আমাকে ভালোবাসতে থাকে ততোই আমার কাছে সে আরো বড় হয়ে উঠতে থাকে।

শিহাবদের পরিবার ছিল সংস্কৃতিমনা। সেই সুবাদে ছোটবেলা থেকেই গান–আবৃত্তিতে শিহাব ছিল প্রথম।

ইউনিভার্সিটি এসেও তার গানের চর্চার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। নববর্ষ, বসন্ত, শারদীয় উৎসবসহ প্রায় সব অনুষ্ঠানে শিহাবের সঙ্গে যেতাম।

আমি দর্শক সারিতে বসে গান শুনলে সে নাকি স্টেজে গান গাইতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো। তাই আমিও সব সময় তাকে উৎসাহ দিতাম যে, তুমি গান চর্চা নিয়মিত করো। ইনশাআল্লাহ একদিন তুমি অনেক বড় শিল্পী হবে।

ছেলেদের পাঞ্জাবি আর মেয়েদের শাড়ি পরা বাঙালি সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট, একটা ঢং বা একটা রীতি বলা চলে। কেননা শাড়ির মতো ফেমিনিন ড্রেস সারা দুনিয়াতে নেই। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য থেকে আজো আমাদের দেশে যে কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ির পরার প্রচলনটা চলছে এবং চলবে। শিহাব আমাকে সব সময় অনুরোধ করতো তার অনুষ্ঠানে শাড়ি পরে আসার জন্য। কিন্তু শাড়ি পরে ঘণ্টার ঘণ্টা দর্শক সারিতে বসে থাকা আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর ব্যাপার বলে শাড়ি পরাটা সব সময় এড়িয়ে যেতাম। এ নিয়ে আমাদের মাঝে প্রায়ই রাগ, অনুরাগ চলতো।

ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেই একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে বেশ ভালো বেতনে চাকরি পেয়েছে শিহাব। খবরটা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বললাম, আর তিন দিন পর ১৪০৮ সাল, বাংলা নববর্ষ। তোমার নতুন ক্যারিয়ারকে উৎসর্গ করেই এবার বাংলা নববর্ষে শাড়ি পরে রমনা বটমূলে যাবো। তোমাকে কথা দিলাম শিহাব।

লাল পাড়ের শাদা জামদানি শাড়ি, খোপায় চায়নিজ বেলী ফুলের মালা এবং কপালে লাল টিপ পরে চমৎকার সেজেছিলাম।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্তাচলের গেটে এসে সকাল সাড়ে সাতটায় রিকশা থেকে নেমে দেখি, রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে আমার জন্যে করুণভাবে অপেক্ষা করছে শিহাব।

পেছনদিক থেকে *শুভ নববর্ষ* বলতেই চমকে উঠলো সে। আমাকে শাড়ি পরিহিতা দেখেই সে এতোই বিমোহিত হয়েছে যে, তার চোখে ভাবের স্বচ্ছতা এবং মুখে ভাবের সরলতা ফুটে উঠছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে বলছিল, আমার পাচ ফিট ছয় ইঞ্চি অপ্সরী হবু রমণীকে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাগছে। আর আমি তার পরশ মাখানো হৃদয় দোলানো কথায় লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিলাম।

অস্তাচলের গেট দিয়ে ঢুকে গল্প করতে করতে বটতলায় এসে সহস্র লোকের ভিড়ের মধ্যে দুজনে পাশাপাশি দাড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছিলাম।

আধঘণ্টা পর হঠাৎ বোমার শব্দে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করে দৌড়াচ্ছে প্রাণ বাচানোর ভয়ে। সেকেন্ডের মধ্যে বোমার ধোয়ায় চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার চোখ জ্বালায় অনবরত পানি ঝরছিল। এমতাবস্থায় শিহাবের হাত ধরে প্রাণ ভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে রমনা থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্য করলাম, আমার দুই হাজার টাকা দামের শখের জামদানি

শাড়ি ছিড়ে এমন টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যা শাড়ির নিচের দিকের বেশির ভাগ অংশই নেই।

নববর্ষের সমস্ত পরিকল্পনা জলাঞ্জলি দিয়ে বেবিট্যাকসিতে চড়ে বাসায় চলে এলাম।

অবাক হয়েছি সেদিন।

স্বাধীন দেশে এমন জঘন্য মানুষ বাস করছে যারা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য রেষারেষি, সংঘাত করে, বোমা মেরে দেশীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

নিজেরা কৌশলে সন্ত্রাস করে, সাধারণ মানুষের হত্যা করে একের দোষ অন্যের ওপর চালানোর অপচেষ্টা করে চলছে।

প্রচণ্ড কেদেছিলাম। আমার মন এতোই আহত হয়েছিল যা প্রায় এক মাস পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি। সব বাধা–বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে জুনের ২৯ তারিখ ২০০১ সালে আমাদের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হলো।

শিহাবসহ বিয়ের সব কেনাকাটা করলাম। *রাপা প্লাজা*–র *রঙ্গুলি* থেকে চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে শিহাবের প্রিয় লাল রঙের বিয়ের কাতান শাড়ি কিনলাম। সেই সঙ্গে আমিন জুয়েলার্স থেকে পনেরো ভরি ওজনের একটা জড়োয়া সেট কিনেছিলাম। মোটকথা, বিয়ের প্রত্যেকটি আইটেমই ছিল খুব সুন্দর এবং পছন্দের।

পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতেই আমার বিয়ে হবে। তাই বাড়ি চলে এলাম।

জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে বারান্দায় বসে বসে ভাবতাম, লাল কাতান শাড়ি পরে সুন্দর করে বৌ সেজে শিহাবের বামপাশে গাড়িতে চড়ে বসবো। মা, ভাই–বোনদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাবো শ্বশুরবাড়ি।

এতোদিন পর প্রিয় স্বামীকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাবো। সুদীর্ঘ বারো বছর যাকে ভালোবেসেছি সেই–ই হবে আমার প্রিয় স্বামী, প্রিয় বন্ধু, সর্বোপরি জীবনসঙ্গী।

অপেক্ষার প্রহর গোনা কতো যে কঠিন তা শুধু ভুক্তভোগীরাই বুঝবে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি সেকেন্ড আমার কাছে হাজার দিনের সমান মনে হতো।

এভাবেই সেকেন্ড, মিনিট, দিন, সপ্তাহ পেরিয়ে জুন মাসের প্রত্যাশিত ২৯ তারিখ চলে এলো। পুরো বিয়ে বাড়ি সাজ সাজ রব। আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, মেহমানে ভরপুর বাড়ি।

সকাল থেকেই বাইরে ভীষণ ঝড় হচ্ছিল। দশ নাম্বার সিগনাল। এই অবস্থায় বরযাত্রীর আগমন নিয়ে সবারই টেনশন হচ্ছিল।

এদিকে বেলা একটার মধ্যে লাল কাতান পরে অপূর্ব সাজে সজ্জিত পূর্ণ যৌবনা হবু রমণী সেজে পথ চেয়ে বসে আছি। এতোদিন পর আমার ভালোবাসার মানুষটি তার প্রিয় লাল রঙের কাতান শাড়ি পরিহিতা বৌ রূপে আমাকে দেখবে। মনে মনে ভেবে পুলকিত হচ্ছিলাম!

দুপুর সাড়ে তিনটা।

বরপক্ষ এখনো আসছে না। আকাশে মেঘের ঘনঘটায় চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। মুরুব্বিদের আশঙ্কায়, আমার অবুঝ মনটাও ছটফট করতে লাগলো।

বিধাতার কি নির্মম পরিহাস!

পথে তুফানে ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে বরযাত্রীর গাড়ির ওপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিহাবসহ তিনজনের মৃত্যু হলো।

বিকাল চারটায় মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমাদের সারা বাড়িতে কান্নার রোল ভেসে পড়লো। বাকরুদ্ধ হয়ে সংবিৎ হারিয়ে ফেললাম।

এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে রিলিজ করলো আমাকে। ধূলিসাৎ হয়ে গেল আমার স্বপ্নের বসতি। কাচের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমার সাজানো অনুভূতি।

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায়, আজো স্বাভাবিকভাবে মনকে স্থির করতে পারিনি।

পারিবারিকভাবে বিয়ের জন্য চারদিক থেকে প্রেশার দেয়া হচ্ছে। মা-বোনেরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাচ্ছে নতুন জীবনে পা দেয়ার জন্য।

কিন্তু যাকে আজীবন প্রাণপণে ভালোবেসে, মনের ভিত্তি স্থাপন করেছি তাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে কি স্থান দিতে পারি?

কোনো মেয়ে কি তার প্রথম ভালোবাসার কথা ভুলতে পারে? দুই হাতে মেহেদি পরে, লাল শাড়ি, লাল টিপ পরে স্টেজে বসে যাকে নিয়ে আমার ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নের দিন গুণছিলাম সেই মনে আমি কি অন্য একজন অপরিচিত মানুষকে ভাবতে পারি? কখনোই না।

সব সময় সবার আড়ালে, গোপনে, নীরবে, নিভৃতে হু হু করে ডুকরে কাদি। আমি জানি, আমার এই কান্নার ধ্বনি শুধু আমার ভালোবাসার মানুষটিই শুনতে পায়। টকটকে লাল হলো আনন্দের প্রতীক!

সেই লাল, সেই শাড়ি, সেই আনন্দ আমার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

তাই আমার জীবন থেকে ঝরে যাওয়া কষ্টের স্মৃতিগুলো বারো হাত শাদা বসনে জড়িয়ে রেখেছি।

প্রতি মুহূর্তেই অবাধ্য সব স্মৃতি শতগুণ জীবন্ত হয়ে ভিড় করছে আমার কষ্টের বন্দরে।

স্বাধীন সাহচর্যের দিনগুলো আমার বিরহকে প্রকট করে তুলছে দিনের পর দিন।

আকাশের পানে তাকিয়ে মনে মনে বলি, শিহাব, আমার যতো ঋণ কেবল তোমার ভালোবাসার কাছে। তাই আমার ভালোবাসার মানুষ শুধু তুমিই।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

গায়ে হলুদ

পাশের বাড়িতে সেদিন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। আমার চাচাতো বোনের বিয়ে। ধুমধাম হচ্ছিল বেশ। বাড়ি ভরা মেহমান এবং বেশ হই চই। ঢেকিতে হলুদ বাটা হলো। রাতে গায়ে হলুদ দেয়া হবে। এ জন্য কয়েকটি মেয়ে আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আবার ভিডিও করা হবে শুনে তো মহা খুশি। রাত হওয়ার পর পরই আমাদের বাড়ির সবাই শাড়ি পরে ঠিকঠাক। এমন সময় বরের বাড়ি থেকে একঝাক মেয়ে হলুদ রঙের শাড়ি পরে গায়ে হলুদ দিতে এলো। রীতিমতো শুরু হলো কাজ। মেয়েগুলো এমনিতে খুবই সুন্দরী। তার ওপর ভিডিও লাইট। সব মিলিয়ে এতো সুন্দর লাগছিল যা লিখে বোঝাতে পারছি না। একটি মেয়ে ছিল অতি সুন্দরী।

আমি সামনে দাড়িয়ে বললাম, সবাইকে খুব সুন্দর লাগছে।

ওই সুন্দরী মেয়েটি জবাব দিল আমার। বললো, আরো সুন্দর জিনিস আছে, আপনাকে দেখাবো। তখন কিছু বুঝতে পারলাম না।

গায়ে হলুদের কাজ শেষ হতে না হতেই মেয়েটি উঠে এলো। সঙ্গে ছিল অন্য একটি মেয়ে। আমাকে ইশারায় ডাক দিল। গেলাম তাদের কাছে। আমার পরিচয় দিলাম এবং তাদের পরিচয় জেনে নিলাম।

মেয়েটি বললো, আপনার রুমে চলুন।

সবাই রুমে ঢোকার পর মেয়েটি বললো, আপনাকে আরো সুন্দর একটি জিনিস দেখাতে চেয়েছিলাম। সেটা দেখবেন না?

বললাম, দেখবো।

সে হলুদ রঙের শাড়িটি সম্পূর্ণ তুলে ফেললো। দেখলাম তার দুই পায়ের মাঝে।

আমাকে দেখিয়েই সে চলে গেল। যাবার সময় বললো, আজই এর সঙ্গে পরিচয় করাবো আপনাকে।

রাতে সবার খাবার পর মেয়েটি আমার রুমে আবার এলো। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমু খেতে আরম্ভ করলো। আমি আর কি করবো? শাড়িটি তুলে শুরু করলাম আমার পরিচয়। দ্বিতীয় দিনে আরো দুবার একইভাবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মেয়েটি আমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল। কিন্তু বলেছিলাম, শাড়ির নিচেরটার সঙ্গে পরিচয় আগেই তো হলো এখন আর ভালোবাসার কি দরকার।

নাম ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

গোপন ফুলদানি

– শাহীন

টানা কয়েক বছর প্রেম করার পর বিয়ে হলো আমাদের। ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস সবই বেশি বেশি – শুধু অর্থ ছাড়া। কারণ তখন আমার নতুন চাকরি, বেতন কম। তারও নতুন ব্যবসা। বিয়ের দুই মাস পরই এলো রোজা। তারপর ঈদ। সে বেশ কষ্ট করে লাভের টাকা বাচিয়ে আমাকে দোকানে নিয়ে গেল শাড়ি কিনে দেবে বলে। বিয়ের পর প্রথম শাড়ি। দুজনে মিলে এটা দেখি, সেটা দেখি, ওটা শুকি। ভাবি এটা মেকি। দেখতে দেখতে চোখের সামনে ছোটখাটো টিলা তৈরি হলো। শাড়ির টিলা। দোকানি পরিচিত বলেই এমন খাতির করে শাড়ি দেখালো। অবশেষে কিছু মিরপুর সিল্ক বের করলো। তার ভেতর থেকে একটা দেখে মনে হলো ঠিক এটাই যেন খুজছিলাম। চওড়া জরির পাড়, চমৎকার নকশার বুনন। উজ্জ্বল খয়েরি রঙ–এর পাশে চওড়া সোনালি পাড় দুজনকেই আকৃষ্ট করলো। কিনে ফেললাম। দামটা খুব বেশি না হলেও তখন ওটাই আমাদের কাছে বেশি ছিল। বাড়ি ফিরে আমার হাসি হাসি মুখ দেখে সে খুব খুশি হলো। আদর করলো আর বলে রাখলো ঈদের দিন এই শাড়ি পরে সারাদিন তার সঙ্গে ঘুরতে হবে। মহা আনন্দে রাজি হলাম।

ঈদ এলো। দুপুরের পর ওই শাড়ি পরে সেজেগুজে তার সঙ্গে বের হলাম। যেখানেই যাই, শাড়ির আর নিজের প্রশংসা শুনি। এমনি শুনতে শুনতে রাত এগারোটায় ঘরে ফিরলাম। সে তো প্রশংসা শুনে ভীষণ খুশি। তারপর খুশিটা ষোল আনা উসুল করে ঘুমিয়ে পড়লাম। কারণ পরদিন আবার দাওয়াত খেতে যেতে হবে সকাল সকাল।

পরদিন আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়–স্বজন মিলে প্রায় দশ বারোজন বেড়াতে গেলাম শহর থেকে কিছু দূরে। সেখানে বিদ্যুৎ নেই, টিভিও নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই তাড়াহুড়ো বাধলো সবার ফেরার জন্য। বাসায় ফিরে ঈদের সিনেমা দেখতে হবে আমার ননদ আর খালাশাশুড়ি অস্থির হয়ে উঠছিলেন বার বার।

ফেরার সময় ননদ উঠলো আমার রিকশায়। রিকশায় উঠেই সে হুকুম করে, ভাই, জোরে চালান, আরো জোরে। রিকশাচালকও সুন্দরী সোয়ারির হুকুম পেয়ে যেন উড়ে যাবে এমন অবস্থা। আমার নিষেধ কেউ শুনলো না। তখন খুব বাজে একটা রাস্তায় চলছিলাম আমরা। এখানে ওখানে ঢালাই উঠে যাওয়া খারাপ পাকা সড়ক। আমাদের পঙ্খিরাজ উড়তে গিয়ে এমন ঝাকুনি খেলো যে, ছিটকে কয়েক হাত দূরে রাস্তায় পড়ে গেলাম। পেছনেই আমার স্বামীর রিকশা ছিল। সে তাড়াতাড়ি নেমে আমাকে টেনে তুললো। বোনকে বকলো। নিজের রিকশায় করে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে শাড়ি খুলে দুজনে দেখতে লাগলাম কোথাও ছিড়েছে কি না। পেয়েও গেলাম। তিন চার জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে রাস্তার ঘষা লেগে। আমার হাটুও কেটে গেছে অনেকখানি। তখন আমার সে কি কান্না। যতো না হাটুর ব্যথায় তার চেয়ে বেশি ব্যথা শাড়ির জন্য। পরদিন সে সুন্দর করে রিপু করিয়ে এনে দিল। তুলে রাখলাম ভালোবাসা মেশানো প্রথম পাওয়া শাড়ি স্মৃতি করে।

দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিয়েবার্ষিকী হবে। ঠিক মনে নেই। অফিস থেকে ফিরে দেখি ফুলদানির পানিতে এক মুঠো রজনীগন্ধার ডাটা ডোবানো। পাশে একটা প্যাকেট।

সে বললো, খোলো।

খুলে দেখি রজনীগন্ধার তৈরি কিছু মালা। খোপায় দেবার। আনন্দে মনটা নেচে উঠলো।

রাতে সুন্দর করে সাজবে এগুলো দিয়ে এবং ওই শাড়িটা পরবে সে বললো।

যথাসময়ে দুয়ার এটে শুরু হলো আমার সাজার পালা। সে চেয়ে চেয়ে দেখে আর দুষ্টুমির হাসি হাসে। আমিও। সাজগোজ শেষ।

সে বললো, দাড়াও, বাথরুম পেয়েছে, সেরে আসি।

তার অনুপস্থিতিতে ত্বরিত গতিতে মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। পেতলের ঝকঝকে ফুলদানি। পুরনো আমলের। তবু যেন ফুলগুলো ওখানে মানাচ্ছিল না। আরো সুন্দর ফুলদানি চাই। সে ঘরে ফেরার আগেই শুয়ে পড়লাম।

সে ফিরে বললো, শুয়ে পড়লে যে!

তোমাকে ফুলদানি দেখাবো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুলদানি। ফুলে সাজানো।

কোথায়?

শাড়িতে ঢাকা। তুলে দেখতে হবে।

সে উরুর উপরে শাড়ি তুলে এক পলক দেখার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। হাসতে হাসতে দম আটকে যাবার যোগাড়। সে হাসি যেন আর থামবে না। হাসতে হাসতে বিষম খেলো। তবু হেসেই চলে। আবার দেখলো। প্রাণ ভরে। আবার। আবার। দেখে আর হেসে হেসে গড়াগড়ি খায়। অনেকক্ষণ পর হাসিটা কমে এলে উঠে বসে এবং বলে, সত্যি দুই উরুর ভাজের ওই ছোট্ট ফুলদানিতে একটা মাত্র রজনীগন্ধা। তবু যতো মানিয়েছে পৃথিবীর আর কোনো ফুলদানিতেই হয়তো অতো মানাবে না। আর তুমিই বোধহয় ওই ফুলদানি প্রথম আবিষ্কার করলে। এবার তো ওখানে নেমে দেখতে হয়।

এরপর কিছু উত্তাল সময় কাটলো। সব চেয়ে চেয়ে দেখলো শাড়িটা আর ওই ফুল।

প্রায় এক যুগ হলো। শাড়িটা খুব যত্ন করে রেখেছি।

এখন আর শাড়ির কোনো অভাব নেই। কিন্তু ওইটার সমকক্ষ কোনোটায় হবে না। বেদনায়, ভালোবাসায়, কামনায় সব স্মৃতিময়। ওই শাড়িটা দেখলেই আমাদের মন আনন্দে নাচে। এবং তার মনে পড়ে যায় শাড়িতে ঢাকা গোপন ফুলদানি ও ফুলের কথা। উথলে উঠে হাসির ঢেউয়ে।

নওগা থেকে

প্রত্যাখান

আমি সমাজ বিজ্ঞানে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। আমি নাকি দেখতে সুন্দরী, স্মার্ট, সভ্য এবং ভদ্র। নিজেকে অবশ্য সুন্দরী মনে করি না। তবে সভ্য এবং ভদ্র এটা স্বীকার করি। আমার জন্য কাজিন, বান্ধবীর ভাইয়েরা এবং আব্বুর অফিসের নতুন কিছু অফিসার আছেন তারা একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েই যাচ্ছেন। আমি অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। কারণ আমার মনের মতো জীবনসঙ্গী আমি আজও খুজে পাইনি।

একদিনের ঘটনা। ঘটক এসে আম্মুকে বললেন, তার কাছে নাকি আমার বিয়ের জন্য উপযুক্ত সুপাত্র আছে। ঘটক সেই সুপাত্রের ছবি ও বায়োডাটা সঙ্গে করে নিয়েই এসেছেন। ছেলের ছবি ও বায়োডাটা দেবে আব্বু আম্মু পছন্দ করলেন। ইতিমধ্যে ছেলে নাকি আমাকে দূর থেকে বাস স্টপেজে আমাকে দেখেছে। এবং পছন্দ করেছে বলেই এ প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

আমারও ছেলের ছবি দেখে মোটামুটি পছন্দ হলো। ছেলে তার বাবা মা সহ কোনো এক শপিং প্লাজায় আমাকে দেখেতে চেয়েছে। আব্বু অসুস্থ থাকায় আম্মুই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আম্মুর সঙ্গে কোথাও গেলে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। বলে রাখি, আমার আম্মু সব সময় সালোয়ার কামিজ পরেন। শাড়ি কোনোদিন পরেন না। শুধু আম্মুর বিয়ের দিনই শাড়ি পরেছিলেন। আজ অবশ্য আম্মু শাড়ি পরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার আপত্তির কারণে শাড়ি না পরে সালোয়ার কামিজ পরে এসেছেন।

আমি ও আম্মু নির্দিষ্ট শপিং প্লাজায় ঢুকেই দেখি ঘটক ছেলে এবং তার বাবা মাসহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ছেলের বাবা মায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ঘটক। ছেলের মাকে

দেখে মনে হলো তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন। ছেলের মা আমার ডান হাতটা ধরে বললেন, এমন মেয়েই তো আমি এতোদিন ধরে খুজছি। ছেলে সামান্য একটু দূরে দাড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে। ছেলের বাবা অবশ্য খুশি হতে পারেননি। কারণ আমার আম্মু শাড়ি পরে আসেননি।

ছেলের বাবা আমার আম্মুর পরিচয় পেয়ে আম্মুকে বললেন, মেয়ের সঙ্গে আসতে হলে শাড়ি পরে আসতে হয় এই ভদ্রতাটুকুও জানেন না দেখছি।

এই কথা শোনার পর ছেলের বাবা মাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আম্মুকে হাত ধরে টেনে সোজা বাসায় চলে আসি।

বাসায় চলে এসে আম্মুকে জানিয়ে দিই এ বিয়ে আমি করবো না। পরের দিন অবশ্য ঘটকসহ ছেলের বাবা মা আমাদের বাসায় এসে হাজির হলেন। এবং আম্মুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারা আমাদের বাসায় এসে বাড়িঘর এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে আম্মু আব্বুকে খুব চাপাচাপি এবং অনুরোধ করলেন, আমাকে তার ছেলের বৌ হিসেবে বিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু আব্বু আম্মু আমার মতামতের বাইরে গেলেন না। তাই ওনারা খুব মন খারাপ করে ফিরে গেলেন। পরে শুনেছি ছেলে নাকি বিয়ে না করেই আমেরিকাতে ফিরে গেছে। আমি এখনো সুপাত্রের অপেক্ষায় আছি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

আমার সুখ–দুঃখ

– আকাশ হক

আমি বড়, আমার ছোট এক বোন, তারপর দুই ভাই। বাবা মায়ের বড় সন্তান হিসেবে সংসারের দাবিটাও আমার ওপর বেশি। মা–বাবা, ছোট ভাইবোনের সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে লেখাপড়ার পাট শেষ হওয়ার আগেই ছোটখাটো একটা চাকরি নিলাম। আর্থিক টানাপোড়েনের মাঝেও মোটামুটি ভালোভাবেই দিনগুলো যাচ্ছিল।

সবচেয়ে ছোট ভাইটির বয়স যখন সাত আট বছর তখন একদিন গ্রামের এক নববধূ আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছোট ভাইটি সেই মহিলার শাড়ি টেনে ধরে। কি ব্যাপার! জানতে চাইলে সে বললো, বড় হয়ে আপাকে এমন একটি শাড়ি কিনে দেবো। বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতায় মুগ্ধ হয়েছিল সবাই।

ছোট ভাইবোনেরা কলেজে উঠার পর সম্পূর্ণ পারিবারিক পছন্দে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। পরিকল্পনা করা হলো, আমার বিয়ের তিন দিন পর অর্থাৎ আমার যেদিন বৌভাত সেদিন ছোট বোনের বিয়ে এবং তাকে উঠিয়ে দেয়া হবে। বিয়ের সমস্ত কেনাকাটা করার জন্য ছোট বোন এবং ভাইকে পাঠানো হলো জেলা সদরে। কেনাকাটা শেষে ফেরার পর দেখলাম তালিকার বাইরে কেনা হয়েছে মাঝারি মূল্যের একটা মেরুন রঙয়ের শাড়ি যা ছোট দুই ভাইয়ের টিউশনির টাকা থেকে কেনা। প্রাণপ্রিয় বোনকে ছোট ভাইদের পক্ষ থেকে বিয়ের উপহার হিসেবে দেয়া হবে। হয়তো আমি নিতান্তই স্বার্থপর, না হলে আমার মনে এই ভাবনা কেন আসবে যে, আমিও তো তাদের ভাই, আমার জন্য একটা রুমালও

কিনতে পারলো না? সম্ভবত সেদিন থেকেই মনের ভেতর ভাঙাচোরা শুরু হলো যদিও আমার অনুচ্চারিত শব্দ কাউকে বুঝতে দিইনি।

ছোটখাটো চাকরি করি। তাই আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যেতে পারিনি। প্রতি মাসে সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটির মধ্যে বাড়িতে আসতাম। বিয়ের মাস দুয়েক পর ছুটি শেষে কর্মস্থলে যাবার মুহূর্তে দুইশ ষাট টাকা দিয়ে নিতান্তই সাধারণ পৃন্টের একটা শাড়ি কিনে আনলাম যা স্ত্রীকে দেয়া আমার জীবনের প্রথম উপহার। স্ত্রীর হাত খরচ হিসেবে দিয়ে গেলাম বিশ টাকা। মাস খানেক পর বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললাম, আমার দেয়া শাড়িটা পরতে। স্ত্রী জানালো সেই শাড়িটা বদল করে মেজ ভাই আরেকটা শাড়ি নিয়ে এসেছে দোকান থেকে। খুব ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করি, কার অপছন্দের কারণে সেটা ফেরত দেয়া হলো? কিন্তু আরো অনেক দুঃখের সঙ্গে সেই প্রশ্নটাকেও বুকের ভেতর কবর দিলাম।

আমাদের বিয়ের প্রথম বিয়েবার্ষিকী কিভাবে পালন করলাম সেটা না হয় না-ই বললাম। আমাদের তিন দিন পর ছোট বোনের বিয়েবার্ষিকী। বিকেলে মা বললেন, বোন-ভগ্নিপতিকে কিছু না দিলে সামাজিকতা থাকে না। ছোট বোনের মনটাও খারাপ থাকবে। তখন আমার ছুটি আছে আরো ছয় সাত দিন। তারপর গাড়ি ভাড়া দিয়ে কর্মস্থলে যেতে হবে। অথচ আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকাও নেই। সহযোগিতার হাত বাড়ালো ছোট ভাইয়েরা। ঝটপট পাচশ টাকা বের করে দিয়ে বললো, আপাতত কাজ চলুক, পরে ম্যানেজ করা যাবে। বাজার থেকে শাড়ি এবং পাঞ্জাবি নিয়ে ফেরার পর মায়ের প্রশ্ন, পাঞ্জাবির দাম কতো? বললাম, দুইশ টাকা। মা বললেন, আরেকটু দাম দিয়ে কিনতে পারলি না?

আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি।

আমি আজ দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে। স্বপ্ন দেখছি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবো আর কোনো অভাব-অনটন থাকবে না। স্ত্রীকে কিনে দিতে পারবো নিজের পছন্দের শাড়ি যা ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু আমার দিনগুলো কি ফেরত পাবো? পাবো না। গত পনেরো বছরে কারো কাছ থেকে কিছুই না পাওয়ার সঙ্গে হারিয়ে যাবে আমার দিনগুলোও। ভাবতে নিজের কাছেই অবাক লাগে আত্মীয়স্বজন, ভাইবোন, এমনকি কোনো বন্ধুও দুই টাকা দামের একটা ঈদ কার্ড পর্যন্ত আমাকে দেয়নি। তবুও দুঃখ নেই। তবে সেদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিল ছোট ভাইদের জিজ্ঞাসা করি, তোরা তো সমাজ, সামাজিকতা, সৌন্দর্য আমার চেয়ে ভালো বুঝিস। তিন দিন আগে তো আমারও বিয়েবার্ষিকী ছিল, আমিও তো তোদের আপন ভাই। তাহলে...।

সুধী পাঠক, ক্ষমা করবেন, আমার এবারের প্রশ্নটাও হাজারো প্রশ্নের সঙ্গে আগের মতোই বুকের ভেতর পাথর চাপা দিলাম। আপনারা না-ই বা জানলেন আমার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ।

akash_hak2002@yahoo.com

দরজা খোলা

– মোহাম্মদ আকাশ

আমার লজিং মালিকের বন্ধুর বোন। নাম তার আরজু। আরজু অত্যন্ত চঞ্চল মেয়ে। কোনো ইনফরমেশন ছাড়াই হঠাৎ একদিন বেড়াতে চলে এলো আমার লজিং মালিকের বাড়িতে। আমি যে এ বাড়ির লজিং মাস্টার সেই ব্যাপারে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই ছিল না। সে মনে করতো, আমি এ বাড়িরই একজন সদস্য। সে বেড়াতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী (লজিং মালিকের বৌ) আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ করালেন। ভাবী অত্যন্ত শাদাসিধে মানুষ, কোনো সাত–পাচ বোঝেন না।

প্রথম দিনেই আরজু বায়না ধরলো তাকে সিনেমা দেখাতে হবে। আমি লাজুক ছিলাম। তাই মেয়েমানুষ নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে হবে এ কথা ভাবতেই কেমন যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। অবশেষে ভাবীর অনুরোধে ফয়সালা হলো আগামীকাল *মর্নিং শো* দেখিয়ে আনতে হবে। ভাবীর কথা মতো কাজ।

শো আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আরজুর হ্যান্ডব্যাগে কতো টাকা ছিল জানি না। আমার জন্য জিন্সের প্যান্ট, শার্ট, বিদেশি সেন্ট, ছোটখাটো আরো অনেক কিছু কেনাকাটা করতে করতে তার ব্যয় হিসাবে করলাম তিন হাজার টাকা। এই খরচ যেন তার কাছে কিছুই না। এতো সব কেনাকাটা না করার জন্য তাকে বহুবার বাধা দিয়েছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে? জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে এতো কিছু উপহার দেয়ার মানেটা কি! আমি তোমার কে?

উত্তরে বললো, কোনো মানে–টানে নেই। আমি আপনজনকে উপহার দিতে পছন্দ করি তাই দিলাম।

কোনো কিছু না ভেবেই তার জন্য বারোশ টাকা দামের একটি শাড়ি কিনলাম। সে কোনো বাধা দেয়নি। দাম দেয়ার পর বললো, আমার জীবনেও আমি শাড়ি পেচিয়ে দেখিনি।

বললাম, আমি যখন শখ করে দিয়েছি তখন অবশ্যই তোমাকে পরতে হবে।

সে রাজি হয়ে গেল। সিনেমা পর্ব শেষ করে আমরা বাসায় ফিরে গোসল করে যার যার উপহার সামগ্রী পরতে লাগলাম মূলত একে অপরকে খুশি করার জন্যই। আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে সে দেখতে লাগলো, অনুরূপ আমিও। খাওয়া–দাওয়া পর্ব শেষ করার আগেই সহজ–সরল ভাবী আমার নাম ধরে হেসে বললেন, শাড়ি উপহার দিয়েছো, ভালোই করেছে। খবরদার! শাড়ির ভেতরে আবার চলে যেও না।

ভাবীর কথা শুনে দুজনেই হাসতে লাগলাম।

পরের দিন দুপুরে বাসার ছোট–বড় সকলেই পুকুর ঘাটে গোসল করতে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আরজু শাড়ি নিয়ে আমার কাছে এসে বললো, শাড়ি পরতে পারি না। পরিয়ে দিন।

শাড়ি পরাতে গিয়ে শর্ত দিলাম, তোমার পরনে যা কিছু আছে সব খুলতে হবে, তা না হলে আমি তোমাকে শাড়ি পরাতে পারবো না।

আরজু অতি সংক্ষেপে বললো, যা করা লাগে তাই করুন। তবুও নিজ হাতে শাড়ি পরিয়ে দিন।

কথা মতো কাজ। এক এক করে খুলতে লাগলাম। হাতে হাত, মুখে মুখ, অবশেষে দুজনে সুখের অতল গহবরে হারিয়ে গেলাম। কিন্তু আরজুক শাড়ি পরিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ শাড়ি পরানোর আগেই আমি শাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিলাম।

আরজু পুরো এক সপ্তাহ বেড়িয়েছিল। এই কদিনে আমরা অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছি। ভাবী ব্যাপারটি বুঝলেও আমলে নেননি। এবার আরজুর যাবার পালা। তার মুখে চলে যাবার কথা শুনে কেদেই ফেলেছিলাম। যাবার মুহূর্তে বলেছিল, তোমার যখনি মন চাইবে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার জন্য সর্বদা আমার দরজা খোলা থাকবে।

আরজুর কাছে আমার আর যাওয়া হয়নি।

শুনেছি সে খুব স্বামীভক্ত। স্বামীর একটু সুখের জন্য সে জীবন দিতেও প্রস্তুত।

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে

বিস্ময়

– মোনালিসা

খু–উ–ব ভালোবাসতো সে আমায়। এক অন্য রকমের ভালোবাসা যাকে কোনো বাধনে বেধে রাখা যায় না। যার সবটাতেই আমি, আমাদের একক সত্ত্বা। তার ভাষায় টুই। হয়তো মহাসৃষ্টির কোনো এক সময়েই আমাদের পরিচয়। তারপর অতোটা ভালোলাগার সুযোগ না পেয়েই জন্ম নিল খটমটে একটা ভালোবাসা। কারণ সে ছিল একদমই অন্য রকম। একেবারে অন্য জগতের, অন্য চিন্তার, অন্য ধাচের। এমন কেন সে? তারপরেও তার সব কিছুকেই সঙ্গী করে শুরু হয় আমাদের পথ চলা।

একাকীত্ব ভুলতে খুব সিগারেট খেতো সে। কিসের একাকীত্ব কেই বা জানে। নিজেকে মেলে ধরতে কখনোই ততোটা রাজি ছিল না সে। অনেক বলে কয়েও পারিনি বদঅভ্যাসটা ছাড়াতে। এ নিয়েই একদিন মৃদু কথা কাটাকাটি। তারপর হঠাৎই পাত্তা নেই জনাবের, একদম উধাও। শত চেষ্টাতেও টিকিটির নাগাল মেলেনি। তারপর হঠাৎ এক সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠি। কারণ কড়া নাড়ার ভঙ্গিটা খুব চেনা। দরজা খুলতেই দেখি সে দাড়িয়ে। তাকে দেখতে পেয়েই অভিমানী চোখ বাধ মানেনি।

সে? সে বেশ খুশি। প্রাণের একটা ছোয়া চাহনিতে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেই চাহনি ছাপিয়ে নজরে এলো প্রচণ্ড কষ্ট, আপ্রাণ চেষ্টা সেই হাসিকে জয় করার জন্য।

অজানা সেই অধ্যায় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনো প্রচণ্ড মায়া জড়ানো চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতেই বললো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আর একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এটা তোমার জন্য।

খুলে দেখি খুব সুন্দর একটা তাতের শাড়ি। পছন্দের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া জীবনের প্রথম শাড়ি। তাই আবেদনও ছিল অন্য রকম। ঘোরলাগা অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি শাড়িটার দিকে। কিন্তু মুহূর্তেই প্রশ্ন জাগলো মনে, সে টাকা পেল কোথায়? বাবার টাকা এনে সে আমার জন্য খরচ

করতে নারাজ। তবে? তবে কি? প্রশ্নটা করতেই হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এক মাস কোনো সিগারেট খাইনি, হেটে ফিরেছি সারা শহরময়। সেখান থেকেই অল্প অল্প করে টাকা জমিয়েই কিনে এনেছি।

বিস্ময়ে আলোড়িত হয় আমার মন তার কথায়। আনন্দ অশ্রুতে ভেসে যায় দুই নয়ন। সেই মুহূর্তেই ঝাপ দিতে ইচ্ছা হয় তার বুকে। কিন্তু সে নির্বিকার। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

সেই শাড়ি পরেছি তার দেবারও এক বছর পর তারই জন্মদিনে। শাড়িটার মাঝে তার কষ্ট, ইচ্ছা আর একাগ্রতা বিশাল এক ভালোবাসা হয়ে মিশে আছে যা সব সময় আমাকে ঘিরে থাকে। আজ বেশ কয়েকটা বছর পেরিয়ে মনে পড়ছে সেসব কথা।

এরপরও বেশ কিছু শাড়ি পেয়েছি তার কাছ থেকে। কোনোটা পরা হয়েছে, কোনোটা আজো পরা হয়নি। সব তোলা আছে গভীর ভালোবাসার ছোয়ায়। সেই প্রথম শাড়ি কেনার মতো কষ্ট আর তাকে করতে হয়নি। হয়নি পায়ে হেটে যানবাহনে না চড়ে সুদূর পথ অতিক্রম করে টাকা জমাতে। নিজের বা আমাদের প্রয়োজনেই খুজে নিয়েছে ছোট একটা উপার্জনের উপায়। সব শাড়ির মাঝেও আমার কাছে সেই প্রথম শাড়িটার আবেদন একেবারেই ভিন্ন।

ভালো কথা..., আজো সে ভালোবাসে আমায়। একদমই নিজের মতো করে আকড়ে ধরে আছে আমার সমস্ত সত্ত্বাকে যেমনি করে তার দেয়া শাড়িগুলো আমায় জড়িয়ে রাখে।

আজিমপুর, ঢাকা থেকে

শাড়িপাগল

– শামীমা

ও ছিল শাড়িপাগল। কোথাও বেড়াতে গেলে তার দুচোখ ঘুরে বেড়াতো কোন মেয়ে কেমন শাড়ি পরছে। আর সেটা আমি পরলে কেমন লাগবে আমাকে তাই কল্পনা করতো। ঢাকা থেকে যখনই আসবে, হাতে থাকবে নতুন একটি শাড়ি।

আমার স্বামী যার পরশে আমি হয়ে উঠেছিলাম সম্রাজ্ঞী, যার রাজত্বে আমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না এবং আমাকে নতুন সাজে দেখতেই বেশি পছন্দ করতো, সে সালোয়ার কামিজ পরলে রাগ করতো। বলতো শাড়িতেই তোমাকে মানায় বেশি।

প্রতি মাসে একটা দুটো শাড়ি আমার আলমারির স্থান দখল করতো। বিয়ের দেড় বছরে আমাকে সে তিশটা শাড়ি কিনে দেয়। মাঝে মধ্যে রাগ করে বলতাম, শুনেছি মেয়েরা শাড়ি দেখলে কেনার জন্য পাগল হয়ে যায় এখন দেখি তুমি ওদের চেয়ে কম নও। আমার কথায় ও হাসতো আর বলতো, আমার বৌকে আমি যেমন খুশি সাজাবো।

হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আমার সেই শাড়িপাগল লোকটা মারা যায়। গত ২ মে ছিল আমাদের পঞ্চম বিয়েবার্ষিকী। চুপচাপ বসে ভাবলাম ও বেচে থাকলে আজ কি করতো। রাতে ওর প্রিয় শাড়িটা পরলাম সুন্দর করে। ও যা যা পছন্দ করতো সেভাবেই নিজেকে সাজালাম। আয়নার সামনে দাড়িয়ে

কান্না ভেজা চোখে মনে মনে বললাম, তুমি নেই তাই আর কেউ ভালোবেসে শাড়ি কিনে দেয় না। এখন কেউ আমাকে বলে না শাড়িটা তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। ও মারা যাবার পর থেকে আমি কোনো শাড়ি কিনি না। চাকরির খাতিরে সালোয়ার কামিজ পরতে হয় বেশি। ওর দেয়া শাড়িগুলো আমাকে কাদায়। দামি শাড়িগুলো এখন শোভা পায় আলমারির তাকে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

বিকল্প নারী

– আবু জাকারিয়া

১৯৯৪ সাল। আমার কলেজ জীবনের শুরু। থানা সদরে ছিল আমাদের কলেজ। বাড়ি থানা সদর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। প্রতি ভোর বেলায় থানা সদরের উদ্দেশ্যে রওনা হতাম উচ্চতর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান প্রাইভেট পড়ার জন্য। রাস্তা খারাপ ছিল বলে পায়ে হেটেই পথ চলতে হতো। আমাদের গ্রামের রাস্তার পাশের প্রতিটা বাড়ির সম্মুখ ভাগে দেখা যাবে এক একটা ছোট পুকুর।

রাস্তা দিয়ে আসার সময় আমি আর আমার বন্ধু দূর থেকেই পুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কারণ তাকালেই দেখতে পেতাম চোখ ধাধানো সব দৃশ্য। বাড়ির বৌয়েরা পুকুরঘাটে এসে গোসল করছে শাড়ির আচল পানিতে ফেলে লাল, কালো টসটসে আপেলযুগলের ওপর সাবান ঘষছে। তখন বন্ধুকে বলতাম, কেন যে সাবান হলাম না! সাবান হলে কতো না গভীরভাবে ওই বুকের ছোয়া পেতাম।

দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন খুব কাছে চলে আসতাম, চোখে চোখ পরতেই শাড়ির আচল দিয়ে ঢেকে ফেলতো অতি আকর্ষণীয় ওই উন্মুক্ত যুগল। তখন মনে মনে বলতাম, কেন যে শাড়ির আচল হলাম না! শাড়ির আচল হলে ওই অঙ্গযুগলকে চুম্বুকের মতো ধরে থাকতাম।

প্রতিদিন ওই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসতো।

হঠাৎ করেই একদিন শাড়ি পরা বিশাল আকারের দুই মহিলাকে দেখতে পেলাম। থানার পাশের রাস্তায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে প্রস্রাব করছে। প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাবলাম, আমি হয়তো বা ভুল দেখছি। সঠিক হওয়ার জন্য বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি দাড়িয়ে প্রস্রাব করছে।

সে বললো, হ্যা?

দুজনেই অবাক হলাম। মহিলা হলে তো দাড়িয়ে প্রস্রাব করার কথা নয়। খুব দ্রুত গিয়ে থানায় জানালাম। পুলিশ দেখেই দে ছুট। শাড়ি পরা ছিল বলে দৌড়াতে পারছিল না। শাড়ি খুলতে খুলতে দৌড়াচ্ছিল। এক সময় তাদের উন্মুক্ত বুকগুলো ঝরে পড়েছিল মাটিতে। নারিকেল মালায় তৈরি। এখনো সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে নিজের অজান্তেই হাসি।

গাজীপুর থেকে

চোর

– রোজী

দুটি অক্ষরে গঠিত *শাড়ি* শব্দটি যেন রমণীর হৃদয়ের সঙ্গে মিশে থাকা এক অপূর্ব অনুভূতি। আমাদের দেশে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ প্রেম কম বেশি সব রমণীর মধ্যে আছে যদিও বর্তমান যুগে মেয়েরা কিছুটা শার্ট–প্যান্ট, সালোয়ার–কামিজের দিকে ঝুকে পড়েছে। তারপরও বলবো যে, কোনো একটি শাড়িতে কপালে লাল টিপ পরে আয়নার সামনে নিজেকে দেখার আত্মতৃপ্তি অন্য কোনো ড্রেসে নেই। আজ শাড়ি বিষয়ে লিখতে গিয়েও মন চাইছে, গ্রাম বাংলার দৃশ্য নিয়ে পেইন্টিংয়ের শাড়িটা আমার চাই–ই। না কেনা পর্যন্ত মনকে শান্ত করতে পারছি না।

আমার দুই বছর চার মাসের মেয়ে সামিনকে যখন দেখি, খুব সুন্দর করে লাল পেড়ে হলুদ শাড়িকে জড়িয়ে নেয় শরীরে, তারপর হেলে–দুলে ঢঙ করে হাটতে থাকে তখন দৃশ্যটুকু ক্যামেরাবন্দী করে ফেলি এবং স্রষ্টাকে জানাই অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। আমার জীবনে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর নেই যেন গ্রাম বাংলার সদ্য ফোটা কোনো ফুল।

আবার যখন কোনো প্রয়োজনে আলমারিটা খুলি হঠাৎ চোখে পড়ে যায় ম্যাজেন্টা বেনারসি তখন মনে পরে শাড়ির আচলের সঙ্গে বেধে রাখা পাঞ্জাবির সেই শক্ত বন্ধন যা আজো অটুট আমাদের দুজনের মাঝে সাকো হয়ে আছে আজকের সামিন। বেনারসির ভাজের ফাকে ফাকে এখনো খুজে পাই বাসররাতের মিষ্টি গন্ধ কিংবা নীল জামদানি পরে যখন আমার কর্মক্লান্ত স্বামীর সামনে দাড়াই তখন মুহূর্তেই সব ক্লান্তিকে ধুয়ে মুছে আমরা হারিয়ে যাই এক স্বপ্নের জগতে। এতো গেল শাড়ি নিয়ে আমার জীবনের সুন্দর অনুভূতির কথা। ঠিক এ মুহূর্তে শাড়ি নিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না।

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। ১৯৮২। আমরা বগুড়ার মালতীনগরে থাকি। হঠাৎ প্রচণ্ড হই চই এ বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। অনেক লোক ঘিরে চোর চোর বলে চিৎকার করছে। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের ভরা যৌবন এক যুবতীর। হাটু পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা যুবতীর চুল কেটে দিচ্ছে শক্ত–সামর্থ এক পুরুষ। যুবতীর শরীরে একটি ছেড়া পেটিকোট ও বুকে ব্লাউজের ওপর জড়ানো একটি ছেড়া গামছা। এতো বড় চুল কেটে সুন্দর একটি চেহারাকে বিকৃত করার দৃশ্য সত্যিই কুৎসিত। সহ্য করতে পারছিলাম না। হয়তো একটি নারীর প্রতি নারীর এ আকর্ষণ হৃদয়ের। তাই মনকে স্পর্শ করেছিল ঘটনাটি। সব লোক যখন চলে গেল, প্রচণ্ড আর্তনাদ করছিল মেয়েটি।

অসহায় মেয়েটির আর্তনাদ ও চোখের চাহনির মধ্যে খুজে পেয়েছিলাম হিংস্র নীরব প্রতিবাদ। তারপর ওর মুখেই শুনেছিলাম পুরো ঘটনাটি।

খুব গরিব ভিখারি সে। বয়স সুবিধার নয়, কেউ কাজে নিচ্ছিল না। দুদিন অনাহারে থেকেও সে খাবার চুরি করেনি। নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য সে চার পাচটি বাসায় যখন একটি পুরনো শাড়ি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে ঠিক তখনি বারান্দায় ঝুলে থাকা শাড়িটি দেখে লোভ সংবরণ করতে পারেনি। যেমনি শাড়িতে হাত দিয়েছে অমনি ছুটে আসা কিল–ঘুষিতে রক্তাক্ত হয়েছে। চুলগুলো হারিয়ে পাগলির বেশে

সমাজের কাছে হয়েছে সে নিগৃহীত দাগা দেয়া এক অপরাধী। সেই ছোট বয়সের সেই স্মৃতি আজো আমাকে ভাবায়–কাদায়। শুধু একটি শাড়ির জন্য, একটু লজ্জা নিবারণের জন্য কতো বড় মাশুল দিতে হয়েছে সেই মেয়েটিকে।

আমি জানি চুরি করা মহাপাপ এবং এর জন্য কঠোর শাস্তি দেয়াও বিধান রয়েছে। তারপরও বলছি, আমরা কি সব চুরির অপরাধীকে এতো সহজে শাস্তি দিতে পারি?

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

ঘাতক

– শহীদ

চব্বিশ জুন ১৯৯৯। আমি সখীপুরের মুজিব ডিগ্রি কলেজে যোগদান করি পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে। প্রথম বেতন পেয়ে তিনটি টাঙ্গাইলের শাড়ি কিনি। একটি বড়ফুপু, একটি চাচি এবং অপরটি মায়ের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই মায়ের শাড়িটি অপেক্ষাকৃত বেশি দামে কিনি। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহারের পর দেখা গেল মায়ের শাড়িটিই অপেক্ষাকৃত খারাপ। এতে আমি কষ্ট পাই দারুণভাবে।

এবার আসল ঘটনায় আসা যাক। সম্ভবত নয় সেপ্টেম্বর ২০০০। শনিবার। দশটায় কলেজ ধরার জন্য বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি। আমার বাড়ি থেকে কলেজ প্রায় বারো কিলোমিটার। এর মধ্যে পাচ কিলোমিটার যেতে হয় আবার স্যালো বোটে। শ্যালো বোট মাঝ পথে যাওয়ার পর এক ঘাট থেকে বোটে উঠলো আমার কলেজের এক ছাত্র। আমাকে সালাম দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, স্যার কলেজে যাচ্ছেন? সালামের জবাব দিয়ে বললাম, হ্যা।

পুনরায় সে প্রশ্ন করলো, স্যার, কলেজের খবর জানেন? বললাম, কেন, কি হয়েছে?

সে বিস্ফারিত চোখে বললো, শুনলাম, শাহীনস্যার নাকি গলায় শাড়ি পেচিয়ে সিলিংয়ের সঙ্গে ফাস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার সহকর্মী আবু শাহীন সিদ্দিকী আত্মহত্যা করেছে! নাহ! এ হতে পারে না। নিজেই নিজকে বলতে লাগলাম। বাকি পথ কিভাবে গিয়েছি বলতে পারবো না। সখীপুর গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। শাহীনস্যারের বাসার কাছাকাছি যেতেই বেশ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হলো। সবার একই কথা, শাহীনস্যার আত্মহত্যা করতে পারে না। আমি পৌছানোর বেশ আগেই শাহীনস্যারের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য টাঙ্গাইল পাঠানো হয়েছিল। বিকাল চারটার পর ময়না তদন্ত শেষে মৃতদেহ টাঙ্গাইল থেকে সখীপুর আনা হলো। হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রিয় শাহীনস্যারের মুখটি শেষবারের মতো দেখলো। পরে কলেজ মাঠে জানাজা শেষে নিয়ে যাওয়া হলো তার গ্রামের বাড়ি। আমরা অনেকে সেখানে গেলাম। নিজ বাড়িতে দ্বিতীয়বার জানাযা শেষে তাকে কবরস্থ করা হলো।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে জানতে পারলাম শাহীনস্যার আত্মহত্যা করেনি। আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াসে শাহীনস্যারের গলায় শাড়ি পেচিয়েছিল হত্যাকারীরা। যার অর্ধেক ছিল

সিলিংয়ের সঙ্গে বাধা এবং বাকি অর্ধেক ফ্লোরে পড়ে থাকা শাহীন স্যারের মৃতদেহের গলায় পেচানো। শাড়িটা শাহীনস্যারের স্ত্রীকে দেখানো হলে তিনি জানান, ওই শাড়ি তার নয়। আমরা অনেকে ধারণা করেছিলাম, ঘাতকের ওই রহস্যময় শাড়িই হয়তো শাহীনস্যারের হত্যা রহস্য উদঘাটনে সহায়তা করবে। কিন্তু আজ প্রায় দুই বছর হলো শাহীনস্যারের হত্যা রহস্যের কোনো কূল–কিনারা হলো না।
শাহীনস্যারের হত্যাকাণ্ডের রাতে তিনি বাসায় ছিলেন একা। স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। কালিহাতী থানার সরিষাহাটা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আবু শাহীন সিদ্দিকীর জন্ম হয়েছিল। শৈশবে ভুল চিকিৎসায় বিকলাঙ্গ হয়েছিল তার একটি পা। বাশের সাধারণ লাঠির সাহায্য তিনি বিশেষ কায়দায় ভালো মানুষের চেয়েও দ্রুততরভাবে চলাচল করতে পারতেন। দৃঢ় মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। ছাত্র হিসেবেও ছিলেন মেধাবী। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে রসায়নে কৃতিত্বের সঙ্গে এমএসসি পাস করে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন।
আমি বর্তমানে অন্যত্র চাকরি করছি। কিন্তু শাহীনস্যার তথা সেই রহস্যময় শাড়ির কথা ভুলতে পারছি না আজো। একজন পঙ্গু মানুষকে কেন ঘাতকরা হত্যা করে তার গলায় শাড়ি পেচিয়েছিল? জানি না তার রহস্য উদঘাটন হবে কি না।

কালিয়ান, সখীপুর, টাঙ্গাইল থেকে

রঙ

– বিপ্লব

বিয়ের আকদ হয়ে গেল। কিন্তু অনুষ্ঠান করা হয়নি। অনুষ্ঠান করতে হবে। নানান ব্যস্ততা। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের কাপড়–চোপড় কেনা। আমি এবং আমার জন্য সদ্য বিবাহিত বৌ দিনভর কেনাকাটা করছি, তবুও শেষ হচ্ছে না। তার মধ্যে নতুন আত্মীয়, কার কি পছন্দ, কাকে কতো দামেরটা দেবো, এই নিয়ে নানান দুঃশ্চিন্তা।
শুনলাম আমার দাদিশাশুড়ি নাকি খুব চুজি (Choosy) মহিলা। তার পিতা জমিদার ছিলেন। বুড়ি দেখতেও বেশ লাল টুকটুকে। বোঝাই যায়, বয়সকালে একটা... ছিলেন। ওনার শাড়ি কেনা নিয়ে আরো বেশি টেনশন। শেষে আমরা দুইজন মিলে অনেক দোকান ঘুরে, অনেক ভেবে–চিন্তে একটা শাড়ি কিনে ফেললাম।
ওনার হাতে শাড়ি পৌছে দেয়া হলো এবং বলা হলো, আপনার নাতজামাই আপনাকে এটা দিয়েছে। আমার সামনে বুড়ি চোখ–মুখ কুচকে থাকলেন কিছু বললেন না। পরে শুনলাম, ওনার সামনে থেকে আমি চলে যাওয়ার পর নাকি বলেছেন কি নাতজামাই, কি শাড়ি দিচ্ছে এটা! ছাগলের মুতের মতো রঙ।
পাঠকবৃন্দ, বুঝুন আমার অবস্থাটা। এ রকম রঙের শাড়ি আপনারা কেউ কি কখনো দেখেছেন?

বগুড়া থেকে

বলয় রিং পরীক্ষা

– রুস্তম

আমি তখন এইচএসসি–র সায়েন্সের ছাত্র। ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল ক্লাস। প্র্যাকটিকাল রুমে যথারীতি জবা ম্যাডাম ডেমনেস্ট্রেটর হিসেবে এবং অলকস্যার কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে তদারকি করছেন। বেলা দুটা থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের গ্রুপের প্রায় সবাই এসেছে সেদিন। মিলন, টিপু, মাসুর, মাহবুব, পুতু, শশি এবং দিলা ত্রিরত্নও যথারীতি হাজির। বাইরে সবাই যতোই কিচিরমিচির করি না কেন, প্র্যাকটিকাল রুমে সবাই ভোলানাথ। অলকস্যারের গাম্ভীর্য আর হুংকারে সবার আত্মারাম খাচা ছাড়া।

বাইরে সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। সবাই মনে মনে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। ভালো ছাত্রছাত্রী জাহির করা আর কি? নাইট্রক এসিডের বলয় রিং পরীক্ষা আজ। জবাম্যাডাম সবার টেবিলে টেবিলে এসে বুঝিয়ে গেলেন কোনটার পর কি মেশাতে হবে।

এই ফাকে জবাম্যাডাম সম্বন্ধে না লিখলেই নয়। সার্বক্ষণিক হাসিতে ভরা, অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত, রুচিশীলা এক মহিলা। বাবাকে চিনতেন বলে আমাকে একটু–আধটু চিনতেন আগে থেকেই। খুব সহজেই সকলকে সাহায্য করতেন। না বুঝলে এতোটুকু রাগতে দেখেনি কেউ। সেদিন সুন্দর নীল রঙের জর্জেট শাড়ি পরেছিলেন। আগে অবশ্য কখনোই সেই শাড়ি তাকে পরতে দেখিনি। খুব আধুনিক মহিলা হিসেবে ভালোই লাগতো তাকে।

সেদিন সবার খাতা সই করবেন অলকস্যার। সে জন্য বুকে তিনবার ফু দিয়ে প্র্যাকটিকাল শুরু করলাম। আগে থেকেই ভালো যন্ত্রপাতি বেছে রেখেছিলাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই কর্মচাঞ্চল্য শুরু হলো। একেকজনের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল যখন টেস্ট টিউবের মাঝ বরাবর সোনালি বলয় রিং ফুটে উঠতে লাগলো। হারামজাদা মাসুর আমার পাছায় একটা চিমটি দিয়ে দাত বের করে হাসতে লাগলো।

একে একে সবাই ছুটে যেতে লাগলো অলকস্যার আর জবাম্যাডামের কাছে। এদিকে আমার অবস্থা *লেজে গোবরে।* কার ভেতরে যে কি মেশালাম কিছুতেই রিং হচ্ছে না। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল। এই ফাকে মিলন কানের কাছে ফিশ ফিশ করে বলতে লাগলো, এটা নে, এবার ওইটা ঢাল টিউবে। সাবধান, নাড়াবি না। এভাবে হঠাৎ সে বলে উঠলো, হারামজাদা, তোর রিং দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ম্যাডামের কাছে যা।

আমি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য। সময় কম। এক হাতে টেস্ট টিউব আর চোখ ম্যাডাম যেদিকে বসে আছে। দৌড় সেদিকে। ম্যাডাম! ম্যাডাম! বলতে বলতে হঠাৎ টেস্ট টিউব বাকা হয়ে নাইট্রক এসিড ঠিক চেয়ারের হাতলে গিয়ে পড়লো। ম্যাডাম লাফ দিয়ে উঠে বললেন, হায়! হায়! আমার শাড়ি গেল! শাড়ি গেল!

চিৎকার করতে করতে পানি কোথায় সেদিকে তিনি ছুটলেন। তাড়াতাড়ি পানি দিয়ে তার হাত ধুয়ে ফেললেন। ভাগ্য ভালো, শরীরে বা অন্য কোথাও পড়েনি কিংবা তার ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি যা হলো তার সুন্দর নতুন শাড়িটা ঝলসে গেল। ম্যাডামের কি দুঃখ।

আমার নতুন আমেরিকান জর্জেট শাড়িটা আজকেই পরেছিলাম।

অলক স্যার আমার চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলো। আর আমার অবস্থা? এবার ফাইনাল পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল? স্যার প্র্যাকটিকালে ফেল করাবেন। ম্যাডামের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সবাই মিলে জোর করে পাঠালো। ম্যাডামের কাছে মাফ চেয়ে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরলাম। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলাম কোনোদিন যদি সুযোগ আসে তাহলে অবশ্যই ম্যাডামকে একটা নীল শাড়ি উপহার দেবো।

আজ আমার শাড়ি দেয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সাহস নেই। কারণ এতো সুন্দর মনের ম্যাডামকে শাড়ি দিতে গিয়ে তিনি যদি ফিরিয়ে দেন? বলে রাখা ভালো, ফাইনাল পরীক্ষার সময় আমাকে সাহস দিতে তিনি কোনো ত্রুটি করেননি। সেদিন তিনি ক্ষমা করেছিলেন বলেই আজ আমি এতোদূর আসতে পেরেছি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

হুইল চেয়ার

– নিপুল

ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি। এই জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমার কম বেশি বন্ধু আছে। জীবন চলার পথে কতো মানুষের কতো অতীত আছে। এমন কিছু অতীত থেকে যায় সেটা আনন্দ আবার বেদনার হতে পারে।

আমার এক বন্ধু, তার নাম নয়ন। নয়ন ভালোবাসতো ছবি নামের একটি মেয়েকে। নয়ন যেমন ছবিকে সাগরের মতো ভালোবাসতো ঠিক ছবিও আকাশের মতো নয়নকে ভীষণ ভালোবাসতো। হঠাৎ ছবির পরিবার থেকে তার বিয়ে ঠিক করে ফেললো। নয়নসহ আমরা বন্ধু মহলে কেউ জানি না। কারণ একদিন ছবির ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছবি কলেজে আসে না কেন?

ছবির ছোটভাই বললো, আপু, রাজশাহীতে বড়ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে গেছে।

অনেক কষ্ট করে ছবির বড়ভাইয়ের বাসার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করলাম। নয়নকে বললাম, ছবির বড়ভাইয়ের বাসায় ফোন করে দেখ, ছবি সত্যিই রাজশাহীতে আছে কি না।

পরের দিন নয়ন আমাদের বাসায় এসে আমাকে বললো, ছবি রাজশাহীতে নেই। নয়নের চেহারায় দেখলাম শুধু বিষণ্নতায় ভরা। নিজেকে কষ্ট হচ্ছিল তার দিকে তাকাতে। নয়নকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুই বাসায় চলে যা, দেখি তোর জন্যে কি করতে পারি।

একদিন বিকেলে গান শুনছি ড্রইং রুমে। কিছুই ভালো লাগছে না। বাইরের দরজা শব্দ করে কে যেন আমাকে ডাকছে। দরজা খুলেই দেখি ছবি। ছবির হাতে জামা কাপড় ভরা ব্যাগ। ছবিকে ড্রইং রুমে বসতে বললাম। সে হঠাৎ কেদে ফেললো। ছবিকে বললাম, তুমি কাদছো কেন?

সে আমাকে বললো, নিপুল ভাইয়া, আগামী পরশুদিন আমার বিয়ে। এই জন্য আমি পালিয়ে এসেছি। তুমি নয়নকে এখনই খবর দাও, সে যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে।

নয়নকে খবর দিয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে এলাম। ছবির মুখ থেকে নয়ন সমস্ত ঘটনা শুনলো। এতোদিন ছবি বাসায় বন্দী ছিল। ছবির বাবা তাদের সম্পর্কের কথা সব জেনে গেছে। ছবি বললো, তোমাকে ছাড়া আমি অন্য পুরুষের বাসরঘরের নববধূ হতে পারবো না।

নয়ন বললো, প্লিজ ছবি তুমি একটু শান্ত হও।

আমি বললাম, ঠিক আছে, ছবির সঙ্গেই নয়নের বিয়ে হবে। তবে এভাবে নয়। কারণ পালিয়ে বিয়ে করা ঠিক না। নয়নকে বললাম, তুই সুপুরুষের মতো উভয় পরিবারের সম্মতি নিয়ে বিয়ে করবি।

নয়ন বললো, আমার তো এখনো পড়াশোনা শেষ হয়নি।

ছবি বললো, নয়ন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো।

নয়ন রাজি হলো। কাজি অফিস থেকে বিয়ে করে ফেললো। আমি, কনক, আবিদ, সবুজ স্বাক্ষর করলাম সাক্ষী হিসেবে। আমার পক্ষ থেকে ছবিকে দুটো শাড়ি দিলাম। শাড়ি দুটো নিজে পছন্দ করে কিনলাম। নয়ন বিয়ে করে ছবিকে নিয়ে গেল তার ছোটআপুর বাসায় চিটাগাং। নয়নের আপাদুলাভাই সানন্দে তাদের দুজনকে বরণ করে নিল।

দীর্ঘ দিন পর নয়ন ও ছবির পরিবার তাদেরকে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিল। এই আনন্দে নয়ন বললো ছবিকে, আজ আমরা সারাদিন দুলাভাইয়ের মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়াবো।

ছবিকে মোটর সাইকেলের পেছনে নিয়ে নয়ন বেড়াতে গেল। হঠাৎ শাড়ির কিছু অংশ পেছনের চাকায় আটকে গেল। পেছন থেকে একটা ট্রাক ধাক্কা মেরে তাদের দুজনকে ফেলে দিল। স্থানীয় লোকজন তাদের দুইজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তার ছবিকে মৃত ঘোষণা করেন। নয়ন হারায় দুটি পা। আজ ছবি পৃথিবীতে বেচে নেই। আছে শুধু স্মৃতি যেটা নিয়ে এখনো নয়ন হুইল চেয়ারের বসে কাদে। ছবি সালোয়ার কামিজ পরতো। কিন্তু সেদিন আমার দেয়া শাড়িটা পরে ও দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। আজো সেই চাপা কষ্ট নিয়ে এই পৃথিবীতে বেচে আছি।

নীলমনিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা থেকে

জানোয়ার

– মন

দিন তারিখ মনে নেই। সালটা ১৯৯৭। সবেমাত্র ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে আছি। ভাবলাম চাচার বাসায় বেড়িয়ে আসি। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। পরদিনই চাচার বাসায় পৌছে গেলাম

চট্টগ্রাম। শহরটা আমার সেই প্রথম দেখা। তাই কৌতূহলও ছিল বেশি। যাহোক, আমার চাচি পরম আদরের সঙ্গে বরণ করে নিলেন। সে বাসায় নতুন একটি মেয়েকে আবিষ্কার করলাম। চাচি পরিচয় করিয়ে দিলেন ওনার চাচাতো বোন বলে। তার নাম সাথী। আমার ব্যাচমেট। সাথীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এক মাস পরেই বিয়ে। তাই বোনের বাসায় বেড়াতে এসেছে। সম্পর্কে আমার খালা হয়। তাই মিশতে বেশি সময়ও লাগলো না।

সেদিন বিকেলেই দুজন বের হলাম। প্রথমেই ফয়েস লেক। সত্যি বলতে কি, বরাবরই আমি একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে। তার ওপর যুবতী কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘোরা এই আমার প্রথম। তাই হালকা স্পর্শেই আমি চমকে উঠছিলাম। তার প্রাণখোলা হাসি, চোখের চাহনি আমাকে বার বার আনমনা করে দিচ্ছিল। সে সবই বুঝতে পেরেছিল। লক্ষ্য করলাম, সে যেন ইচ্ছা করেই আমার গায়ে গা লাগাচ্ছে অকারণে হাসছে। আমিও একটু একটু সাহসী হয়ে ওঠে তার আবেদনে সাড়া দিলাম। এক সময় নিজেদের আবিষ্কার করলাম হাত ধরে বসে থাকতে। কথায় কথায় বললাম, তোমার তো বিয়ে হয়ে যাবে কিছুদিন পরেই, তখন তো শাড়ি পরতে হবে।

সে বললো, জানো, আমি এখনো ভালো করে শাড়িই পরতে পারি না।

হেসে বলেছিলাম, ঠিক আছে, আমিই শিখিয়ে দেবো।

একটা কিল দিয়ে সে বলেছিল, এই, আমাকে একটা শাড়ি কিনে দাও না।

তখনো মেয়েদের আবদার প্রত্যাখ্যান করার মতো সাহস আমার হয়ে ওঠেনি। তার ওপর পকেটে টাকা ছিল প্রচুর। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট গিয়ে গাঢ় নীল দেখে একটা শাড়ি কিনে দিলাম।

এক সময় সে কানের কাছে মুখ এনে বললো, এই গাধা, জানো না শাড়ির সঙ্গে আরো অনেক কিছু লাগে?

তারপর সে সেই সব মেয়েলি জিনিসগুলো কিনতে লাগলো। সেদিনই প্রথম জানলাম, মেয়েদের এসবে হরেক রকমের মাপজোক থাকে। তারপর বাসায় ফিরলাম রিকশায় হাত ধরে বসে থেকে। আমার চাচি কিছু সন্দেহ করেনি আমাদের নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা ভেবে।

তারপর রাতটা কোনোভাবে কাটলো। সকালে বেলা করে ঘুম থেকে উঠেই আবিষ্কার করলাম বাসায় আমি আর সাথী একা। চাচা-চাচি দুজনেই বের হয়ে গেছেন যার যার কাজে। চাচি ফিরবেন দুপুর একটার পরে। অসহ্য নীরবতার মাঝে নাশতা সেরে সাথীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। কিন্তু গল্প যেন জমছে না।

তারপর সাথী বললো, যাই, শাড়িটা পরে আসি। আমাকে সাহায্য করতে হবে না। বলেই শাড়ি নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো।

ততোক্ষণে আমি ঘেমে একাকার। গলা শুকিয়ে কাঠ। নিঃশ্বাসে গরম হাওয়া। এক সময় সে বেরিয়ে এলো। আমি হা করে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। তার অবিন্যস্ত শাড়ি পরাতে অনাবৃত পেটের একাংশ, বুকের উর্ধাংশ দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না।

শাড়ির ভাজ ঠিক করার কথা বলে তার কাছে গেলাম। গায়ে লাগলো তার তপ্ত নিঃশ্বাস। শাড়ির আবরণ ঠেলে বেরিয়ে আসা নিটোল দুটি স্তন আমাকে অস্থির করে তুললো। আর পারলাম না। তাকে

জড়িয়ে ধরলাম। টেনে বেডরুমে নিয়ে গেলাম। শাড়ি পরা হয়নি বলে তাকে নিরাবরণ করলাম। ততোক্ষণে সে অস্থির হয়ে শুধু বলছে, আমাকে নাও, নাও।
আমি তার মুখে মুখ, বুকে বুক, ঠোঠে ঠোট রেখে ক্ষিধে অনুভব করলাম।
তারপর এক সময় সব শান্ত হয়ে এলো। ক্লান্ত আমি মেঝে থেকে নীল শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে তার গায়ে দিতে দিতে বললাম, চাচি আসার সময় হয়েছে, যাও গোসল করে এসো।
সে শুধু বলেছিল, জানোয়ার।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

জয়তু

– জেরিন

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে যেদিন প্রথম শাড়ি পরে আমি আমার জানের কাছে এসেছিলাম। আমার পরনে ছিল তার প্রিয় হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি। সে আমাকে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি লাজুক পায়ে তার মুখোমুখি দাড়ালাম।
সে মুগ্ধ স্বরে বললো, তুই এতো সুন্দর!
আমি শাড়িটা যত্ন করে তুলে রেখেছি আর একবার পরবো বলে। যেদিন আমাদের বিয়ে হবে তার পরদিন সকালে। সেদিন ভোরে গোসল সেরে ভেজা চুলে ওই শাড়িটা পরবো। এরপর ওর ঘুম ভাঙাবো। আমার হাতে থাকবে গরম কফির মগ।
আমার মৃদু ডাক আর চুড়ির শব্দে ও ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাবে। দেখবে সাত বছর আগের সেই কিশোরী আজ তরুণী হয়ে তার গা ঘেষে বসে আছে তার প্রিয় সেই শাড়িটা পরে। আমি জানি সেদিনও সে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে বলবে, আমার বৌ এতো সুন্দর! জয়তু শাড়ি। কারণ আমাদের ভালোবাসার প্রথম দিনে আমার পরনে ছিল শাড়ি।

আজিমপুর, ঢাকা থেকে

কুচি

– রত্না পদ্ম

পাচ কি ছয় বছর আগের কথা। মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজে পড়ি। খুব ইচ্ছা হয়েছে প্রেমিক পুরুষটিকে শাড়ি পরে দেখাবো। তারও খুব ইচ্ছা হয়েছে আমাকে নতুন রূপে দেখার। অবশেষে আমাদের ইচ্ছা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। কি যেন এক উৎসব চলছিল কলেজে। সেই সুযোগে কলেজে গিয়ে বান্ধবীদের সহায়তায় শাড়ি পরে কলেজ থেকে বের হলাম। কলেজ থেকে বের হয়ে তার মুখোমুখি হতেই তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সত্যি সে মুগ্ধ হয়ে দেখছে আমাকে। তার চোখে–মুখে আনন্দ চিক চিক করছে। সেই ছোটবেলায় একবার শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেছিল সে আমাকে। কিন্তু

তখন তো আর প্রেমিক মনটি ছিল না। এই প্রথম সে মুগ্ধ নয়নে প্রেমিক মন নিয়ে আমাকে দেখছে। শাড়ি পরে তার সামনে দাড়িয়ে আছি। সত্যি খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম।

যাহোক, বেশিক্ষণ দাড়িয়ে না থেকে রিকশায় চেপে যথাসময়ে চলে গেলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পার্কে।

এ জায়গাটি আমাদের দুজনের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা। ভেবেছিলাম খুব মজা করে দিনটি কাটিয়ে দেবো। রিকশা থেকে নেমে দুই চার কদম হাটতেই চাপা একটা চিৎকার দিয়ে দাড়িয়ে পড়লাম। সে চিৎকার শুনে ঘুরে দাড়িয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো, হাটছো না কেন? আমি শাড়ির কুচিগুলো শক্ত করে ধরে দাড়িয়ে আছি। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পাচ্ছি না।

সে আবার বললো, কি ব্যাপার, কি হলো? আমি এদিক–ওদিক তাকিয়ে আস্তে করে বললাম, পায়ে পাড়া লেগে শাড়ি খুলে গেছে।

সে হেসে ফেললো। তারপর একটু কঠিন হয়ে বললো, মেয়ে হয়েছো অথচ শাড়ি সামলাতে পারো না!

লজ্জায় নির্বাক হয়ে গেলাম। এতো লজ্জা কোথায় রাখি?

ভাগ্য ভালো দুপুর বারোটা বলে পার্কে মানুষের আনাগোনা কম। মনে হয় তেমন কেউ বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা।

যাহোক, শাড়ির কুচিগুলো শক্ত করে ধরে তার আড়ালে লুকিয়ে আস্তে আস্তে হেটে একটা মোটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলাম এবং তাকে বললাম, তুমি চার পাশটা দেখো, আমি শাড়ি ঠিক করে নিই। সেদিন আর শাড়ি পরে বেড়াইনি, ভয়ে এবং লজ্জায়। পাছে যদি আবার শাড়ি খুলে যায়। সারাদিন পার্কের এক কোণে বসে দুজনে গল্প করে অবশেষে বাসায় ফিরি। তারপর অনেক বছর শাড়ি পরে তার সঙ্গে বের হইনি কোথাও।

আজ অনেক বছর পার হয়ে গেছে। অনেক বড় হয়েছি আমরা। মাঝে মাঝে শাড়ি পরে সেই পার্কে বেড়াতে যাই। এখন আর কোনো সমস্যা হয় না। আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখলে সে আজো হেসে বলে ওঠে, সাবধানে হেটো আবার যেন শাড়ি খুলে না যায়।

ময়মনসিংহ থেকে

বিভ্রাট

অনেক ঝামেলার পর তার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়েই গেল। সুতরাং দেরি না করে তাকে আমার কার্যস্থল ঢাকায় নিয়ে এলাম। বছর খানেকের মধ্যে আমার বাসা শ্বশুরবাড়ি ছাড়া তার আর কোথাও যাওয়া হয়নি। অন্তত তার বাপের বাড়ি যাওয়াটা হয়নি শুধু আমাদের বিয়ে উপলক্ষে নব্য সৃষ্ট কিছু আত্মীয় ভিলেইনের জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি এসে তার এক কাজিনের বিয়ে উপলক্ষে সমস্ত সমস্যার এক সমাধান হয়ে গেল। সে তো খুশিতে বাকবাকুম। আমারও মন্দ লাগছিল না। হাজার হোক শ্বশুরবাড়ি বলে কথা! অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি নিয়ে ফেললাম।

বর্ষণমুখর এক বিকেলে আমার শ্বশুরবাড়ি বগুড়ায় পৌছালাম। সারা বাড়ি গম গম করছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠি সব জায়গায়ই অর্থাৎ পাশাপাশি আলাদা আলাদাভাবে মিলেমিশে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি দৃষ্টান্তমূলক হতে পারে এখনকার সময় যে কোনো পরিবারের জন্য।

নতুন জামাই হিসেবে বাসার এক কর্নারে বাথরুম সংযুক্ত এক রুমে আমাদের জায়গা হলো। আমাদের রুমের পাশেই একটা বিরাট বারান্দা। আমার বেশির ভাগ সময় ওখানেই পায়চারী করে আর সিগারেট ফুকেই কাটছিল। বৌয়ের তো কোনো পাত্তাই পাচ্ছিলাম না। তিনি স্রেফ প্রজাপতি হয়ে গেছেন। তার প্রতি মুহূর্তের অবস্থান কারোও পক্ষেই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না।

সবচেয়ে ভালো লাগছিল মনে হচ্ছে, সবগুলো বাসা মিলেই একটা পরিপূর্ণ ইউনিট। কে কোথায় খাচ্ছে, কোথায় ঘুমাচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। শুধু নতুন জামাই হিসেবে নিজে বেশ একাই হয়ে গেলাম। তবে মাঝে মধ্যে আমার ছোট মামাতো, খালাতো, ফুফাতো শালিকা খবরাখবর রাখতো। তবুও নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছিল। নতুন জায়গায় এলাম। চারদিকে বিয়ের আমেজ, রোমান্টিক পরিবেশ। আর কি? কিন্তু আমার বৌকে রাতে, তাও আবার গভীর রাত ছাড়া পাওয়াই যায় না। তবুও তার অনেক দিন পর উচ্ছলতা দেখে নিজের এই সাময়িক বঞ্চনা মেনেই নিয়েছিলাম।

সময় কাটছিল বেশ তাড়াতাড়িই। সেদিন দুপুরের পর থেকেই বেশ ঝম ঝম বৃষ্টি। আকাশ এই ফর্শা হয় তো, এই কালো। এই অবস্থায় সেদিন মেয়েপক্ষ অর্থাৎ আমাদের মেয়ের গায়ে হলুদ সন্ধ্যার পরে সবাই কিছুটা শংকিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশু কথা চিন্তা করে। অবশ্য এ জন্য প্রচুর চার্জারের ব্যবস্থা করা হলেও ভিডিও করার ব্যাপারটা নিয়ে মেয়েরাই বেশি চিন্তিত।

দুপুরে খাবার-দাবারের পর থেকেই শুরু হয়েছে মেয়েদের সাজগোজের আয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, আমার বৌ সাজগোজ বিশেষজ্ঞ। তাই কিছুটা এ বাসারই নিচতলায় বেশি হচ্ছে। তিনি মাঝে মধ্যে উপরে উঠছেন। আমার সঙ্গে দুই একটা কথা বলছেন এবং তার জিনিসপত্র নিয়ে আবার নিচে নামছেন।

বৃষ্টির বিরাম নেই। চারদিকে বেশ অন্ধকার, রুমের জানালা-দরজা বন্ধই প্রায়। রুমের একমাত্র দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে শিহরিত হচ্ছিলাম নিজে নিজেই। কিন্তু একাই রুমে শুয়ে আছি। আমার বৌ আমার জন্য কাপড়-চোপড় বের করে দিয়েছেন। কিন্তু পায়জামা-পাঞ্জাবি পরতে বড়জোর পাচ মিনিট। সুতরাং কোলবালিশ নিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তরও দেখছি না।

এমন সময় হঠাৎ ওনার প্রবেশ। আমার অবস্থায় একটু চমকালেও খুব একটা ভাবান্তর হলো না। সুটকেস থেকে তিন তিনটা শাড়ি বের করে পরার বিষয়ে মতামত চাইলেন। বিয়ের আগে তাকে একটা কমলা রঙের জামদানি শাড়ি দিয়েছিলাম। শাড়িটা আমার খুব পছন্দের।

শাড়িটা পরলে তাকে লাগে হলুদ পরীর মতো। সুতরাং আমার মতামতটা ওটার পক্ষেই গেল। বেশ খুশিই হলো। তাকে খুশি করার বিনিময়ে কিছুক্ষণের জন্য এই রোমান্টিক পরিবেশটা সেলিব্রেট করার কথা বললাম। অন্তত এতে আপাতত আমিও কিছুটা খুশি হই। অভয় দিলাম এ পরিবেশে খুব একটা সময় বোধহয় আমরা কেউ-ই নেবো না। তার মুখে ক্ষণিক হাসি, ভ্রূকুটি ও ভেংচি, এবং পর পর

কয়েকটি অভিব্যক্তি দেখলাম। দৌড়ে আমার ঠোটে ঠোট ছুয়েই ধেয়ে গেলেন তিনি নিচতলা মুখে কিছু বুঝে ওঠার আগেই!

কি আর করা। সিগারেট ধরিয়ে খোলা গায়ে পায়চারি করছিলাম খোলা বারান্দা। মাঝে মধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা ভালোই লাগছিল। আনমনা হয়ে ছিলাম মনে হয় অনেকক্ষণের জন্যই। আবেশটা কেটে গেল হঠাৎ বজ্রপাতে। বাইরে বেশ অন্ধকার। বৃষ্টির একটানা শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছিল নিচতলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ হাসির রিনিঝিনি।

নিজেকে বড় বেশি বঞ্চিত লাগছিল। হৃদয়ঙ্গম করছিলাম কারো অনুকম্পায় বেচে থাকাটা কতোটা কষ্টের হতে পারে! চাপা একটা ক্রোধের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম নিজের ভেতরে। ঠাণ্ডা বাচাতে রুমে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম কারেন্ট নেই। সারা রুমে আলো–আধারের খেলা। হঠাৎ বাইরে থেকে অন্ধকার রুমে ঢুকে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

হঠাৎই চুড়ির হালকা রিনরিন আওয়াজে সমস্ত ইন্দ্রিয় শিকারি বাঘের মতো হয়ে উঠলো। খেয়াল করতেই দেখলাম সেই পরিচিত কমলা শাড়ি। মুহূর্তেই দরজা বন্ধ করলাম এবং শাড়ির মানুষটিকে পেছন থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলাম। সারা শরীরে আমার রাগ ও কামের উন্মাদনা। নিমেষে পশুতে পরিণত হলাম। নিজে তো অর্ধেক বিবস্ত্র হয়েই আছি। সুতরাং শুরু হলো বস্ত্র হরণের পালা। নিজেকে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম বিছানায় তার ওপরে। আমার দুই হাত ব্যস্ত তার সারা শরীরের ভাজে ভাজে। অবশেষে তার সুকোমল বুকের খোজ পেলাম। এক হাত ব্যস্ত হলো সেগুলো নিষ্পেষণে।

অন্য হাত দিয়ে ধরে আছি তার রেশমি কালো চুল। ধীরে ধীরে তার ভেতর সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে। আর আমি তো সেই কখন থেকে উদ্যত তলোয়ার হাতে প্রস্তুত!

হঠাৎ তার নিঃশ্বাসের বিস্ফোরণ শুনলাম। হালকা কাতরানোর আওয়াজটা আজ বড় বেশি কানে বাজলো। অবচেতন মনেই ডান হাতটা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল তার বুকের উপত্যকায় কালো তিলটার খোজে।

ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরে আসছিলাম। প্রচণ্ডভাবে চাইছিলাম তার বুকের কালো তিলটা। এদিকে বাম হাতে মোবাইলটা পেলাম। একটা বাটন চাপ দিতেই হালকা সবুজ আলোয় তার মুখের এক পাশটা আলোকিত হয়ে উঠলো।

হাতটা উপরে তুলতেই স্বল্প আলোতে তার পরিচিত মুখটার বদলে অন্য কিন্তু খুবই পরিচিত আরেকটা মুখ দেখলাম। এক ঝটকায় বিছানা থেকে নামলাম। মুহূর্তে পায়জামা হাতড়ে খুজে পেয়ে পরতে পরতে দরজা খুলে বারান্দায়!

এ আমি কি দেখলাম! কি করলাম! হায় আল্লাহ, আমার মৃত্যু হলো না কেন? বারান্দার গৃলে মুখ লাগিয়ে বৃষ্টিতে ভিজছি। চোখের জল আর বৃষ্টির জল মিলে মিশে একাকার। মনে মনে বিড় বিড় করছি ধুয়ে যাক, মুছে যাক সব কালিমা...। অনেকক্ষণ ধরেই বোধহয় এভাবে ছিলাম। আমার বৌয়ের গলার আওয়াজে চেতনা ফিরলো।

ও তুমি এখানে? একা একা কি করছো? মন খারাপ বুঝি? লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। তুমি না মাঝে মধ্যে কি যে অবুঝের মতো আবদার করো?... জানো, আমার মনটা না খুব খারাপ। শখ করে স্মৃতি

তোমার পছন্দ করা শাড়িটা পরবে বলে চাইলো। না করতে পারলাম না। তার বলে অনেক দিনের শখ এ রকম একটা শাড়ি পরার।

আমি নিশ্চুপ।

আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, শাড়িটা যখন শেষ দেখেছো তখন কি ছেড়া ছিল?

না সূচক মাথা নাড়লাম।

কিন্তু দেখো, বেচারা স্মৃতি পরতে গিয়ে দেখে শাড়িটা ছেড়া। খুব মন খারাপ, কাদছে। সে বললো, আর গায়ে হলুদেই যাবে না, তার ভাগ্যটা নাকি সব সময়ই এমন খারাপ হয়। কি, খারাপ লাগছে না তোমার?

আমি কাদছি। বৃষ্টির জন্য অন্তত কেউ চোখের পানিটা ধরতে পারবে না! খুব কি বেচে গেলাম? কিন্তু বিবেক কি আমার পিছু ছাড়বে?

স্মৃতি হলো তার এক কাজিন, আমার ছোট বোনের মতো দেখতে যাকে আমি হৃদয়ে স্থান দিয়েছি আমার ছোট বোন হিসেবেই।

হায় শাড়ি!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বগুড়া থেকে

তিন চাকার যাত্রী

– হুমায়ন কবীর কমল

আমি আমার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমি বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো। শত কষ্টের মধ্যেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার এইচএসসি পরীক্ষার যখন মাত্র পাচ মাস বাকি তখনই মাকে বলেছিলাম আমার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যোগাতে। আমার মা ছিলেন একজন কাজের বুয়া। তার (আমার মা) সাহেবকে আমার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সাহেব তো আর দয়ালু নয় যে, তার টাকা অন্য কারো ছেলের জন্য দেবেন।

তিনি যখন মাকে নিরাশ করলেন তখন আমাকে বাধ্য হয়েই বলুন আর নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই বলুন, শুরু করলাম রিকশা চালানো মানে আমি তখন ত্রিচক্রচালক।

কিছুদিন পর যখন রোজার ঈদ এলো তখন আমার ত্রিচক্রযান আমাকে দিল অধিক আয় এবং আমার মাকে দিল সতেরোটি শাড়ি। আমার পরীক্ষার জন্য আমাকে আর টাকার চিন্তা করতে হবে না।

নিজের জন্য কিছু নতুন পোশাক কিনে আর মায়ের জন্য আমার আয়ের টাকা থেকে নতুন শাড়ি, ব্লাউজ, চামড়ার স্যানডাল কিনে নিলাম। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালিয়েছি এবং আমার মায়ের শাড়ি বিক্রি করা টাকা দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাস করলাম স্টার মার্কস নিয়ে।

আমার জীবনকে আরো উন্নত করার সুযোগ পেলাম আমার মায়ের শাড়ি বিক্রির টাকার জন্য।

এ শাড়িই আমার জীবন এনে দিয়েছিল সবচেয়ে বড় সাফল্য।

আমি সবেমাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। মা খুব গরিব বলে আমাকেই মা এবং নিজেকে চালাতে হয়। আমি রিকশা চালাই এবং আমার লেখাপড়া চালাই।

একদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, রাস্তা ছিল ফাকা প্রায় যানজটমুক্ত। আমার তিন চাকায় এক যাত্রী একজন অপরূপা সুন্দরী নারী। সে পরেছিল একটা সুন্দর আকাশি রঙ–এর শাড়ি সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে ব্লাউজ, তিন ইঞ্চি লম্বা এক জোড়া হিল। ভাড়া মেটাতে গিয়েই আমি তার অপূর্ব মুখ দেখে থমকে দাড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণ ছিলাম জ্ঞানশূন্য। তার গন্তব্যস্থান ছিল কারওয়ান বাজার। আমি আকাশ, কুসুম কল্পনা করছি আর সামনে এগোচ্ছি। গন্তব্যে পৌছে সে যখন আমার পিঠে হাত রেখে বললো, এই দাড়াও তখনই আমার সমস্ত শরীর এক ছন্দের তালে দুলে উঠেছিল।

আমি হতবাকের মতো দাড়িয়ে আছি।

এই, ভাড়া নাও, বলে টাকা দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে তাকে মনে হচ্ছিল আরো বেশি সুন্দরী, ব্লাউজের নিচে পরা ব্রা দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। আমি সামান্য পরেই বুঝতে পারলাম তাকে কোনোদিনই পাবো না।

তবুও তার চিন্তায় সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। শুধু মনে হয় কখন তার কাছে যাবো। এভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন।

তারপর আরেক দিন একই শাড়ি, একই ব্লাউজ আর কপালে একটি টিপ দিয়ে পেছন থেকে সেই শব্দগুলো শুনলাম।

এই রিকশা, কারওয়ান বাজার যাবে?

বুকের মধ্যে মোচড় দিল। ফিরে তাকালাম। সেই মেয়ে।

যাবো বলতেই বললো, ও তুমিই।

নানান কথা যেমন তোমার বাড়ি কোথায়? কবে থেকে রিকশা চালাও প্রভৃতি বলতে বলতে, এই থামো থামো।

পেছনে ফিরে দেখি, আমার ত্রিচক্রযানের একটি চক্র তার শাড়ির আচলকে আপন ভেবে তার বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। থামতে থামতেই সে আমার রিকশা থেকে রাজপথে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো।

কি করবো ভাবতে ভাবতেই আমার শার্টটি দিয়ে তার স্তন দুটিকে আড়াল করে শাড়ির আচল ছিড়ে রিকশার মায়া ছেড়ে তাকে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। জ্ঞান ফেরার পর জানতে পারলাম তার নাম চাদনী। বাসা বনানীতে। বাবা পুলিশের কর্তাব্যক্তি। তারপর টেলিফোন পেয়ে তার বাবা এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

তিন দিন পর ক্লাসে গেলাম। যা দেখলাম সেটা অবিশ্বাস্য! সে আর আমি এক ক্লাসে একই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছি।

তখন আমার মন আমাকে শুধু তার দিকেই তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করছে। আমি ভালো ছাত্র হওয়ায় আমার ধন সম্পত্তির দরকার ছিল না তার সঙ্গে ইয়ে মানে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্য।

দুই তিন মাসের মধ্যে বন্ধু থেকে তার কাছে হয়ে গিয়েছিলাম প্রেমিক। সে যেদিন আমাকে তার মনের কথাগুলো বলে তার তিন দিন পর তাকে ওই রকম আকাশি রঙ–এর শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম।

যখন সে শাড়ি পরে আমার সামনে এসেছিল মনে হচ্ছিল সে নিশ্চয়ই পরী। আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরি বুকের মাঝে। বন্ধুর রুম ফাকা থাকায় সেও সাহস নিয়ে আমার ঠোটে ঠোট রেখে আদর করলো। এক সময় হয়ে উঠলাম দুইজন থ্রি-এক্স ছবির নায়ক-নায়িকা।

প্রথম মেয়ে আমার জীবনে সে। আর প্রথম ধাক্কাতেই যখন কেদে দিয়েছিল মেয়েটি তখনই বুঝলাম আমিই তার প্রথম পুরুষ।

আমি এখন তার হবু স্বামী। তার বাবা আমাকে খুব স্নেহ করেন। তার বাবার জন্যই আমি এখন পল্লি বিদ্যুৎ অফিসের জিএম।

প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে সেই আকাশি রঙ-এর শাড়িই তাকে গিফট দিই।

মিশ্রিপাড়া, দয়ারামপুর, নাটোর থেকে

অপরাধ বোধ

-রুনা

বিয়ের আগে থেকেই শাড়ি পরার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু কেন জানি বিয়ের পর আমার স্বামী শাড়ি পরতে দিতে চাইতো না। তার ধারণা, শাড়ি সামলাতে পারবো না। ইচ্ছা হতো শাড়ি পরে সেজেগুজে তার সঙ্গে ঘুরতে। কিন্তু যখনই সে আমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে তখনই বলতো সালোয়ার-কামিজ পরো, না হলে নিয়ে যাবো না। তখন খুব খারাপ লাগতো। বিয়ের দুই বছরের মাথায় আমি মা হতে চললাম। ডাক্তার খুব সাবধানে চলাফেরা করতে বলেছে। আমার স্বামী সব সময় আমার দিকে খেয়াল রাখতো। সেই সময় আমার নানি এলেন আমাকে নিতে। তার ইচ্ছা ছিল না আমাকে যেতে দিতে। কারণ গাড়ি ও রিকশার ঝাকুনিতে আমার যদি কোনো অসুবিধা হয় তাই। আমার জেদে সে রাজি হলো। অবশেষে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। আমি শাড়ি পরে তৈরি হচ্ছি এমন সময় সে বললো, শাড়ি পরো না, সামলাতে পারবে না। তবে নানি সালোয়ার-কামিজ পরতে দিলেন না। বললেন, এ সময় সালোয়ার-কামিজ পরলে দেখতে খারাপ লাগবে।

তাই আমি শাড়ি পরলাম। ও নানিকে বলে দিলো আমাকে যেন খুব সাবধানে নিয়ে যায়, রিকশায় যেন কোনো ঝাকুনি না লাগে। যথারীতি রওনা দিলাম।

গাড়ি থেকে নেমে রিকশায় উঠলাম আর মনে মনে আল্লাহর কাছে দয়া চাচ্ছি কোনো অসুবিধা যেন না হয়। কিন্তু ততোক্ষণে আমার শাড়ির আচল রিকশার চাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো কে যেন আমাকে খুব জোরে রিকশায় থেকে নামিয়ে নিচ্ছে। আমি চিৎকার দিলাম। বললাম, রিকশা থামান।

বলেই যাচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নানি আমাকে ধরলেন। রিকশাচালক রিকশা থামালো। তখন আমার এক পা রিকশায় আর এক পা রাস্তায়। নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেকখানি হাত কেটে গেল এবং পায়ে আঘাত পেলাম। আমার ও নানির যেন কোনো হুশ নেই। রিকশাচালক তার গামছা এগিয়ে দিয়ে বললো, *এই লন আফা, গামছাটা গায়ে দেন।* তখন যেন আমার হুশ ফিরে এলো।

দেখলাম কোমরে শুধু কাপড় পেচানো আছে। বুকের সামনে কোনো কাপড় নেই। অর্ধেকটাই চাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানির বোরখার ওপরের ওড়না টেনে গায়ে দিলাম আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ দেখলো কি না।

তখন রাস্তাটা ফাকা ছিল। যতোটা লজ্জা পেলাম তার চেয়ে বেশি ভয় পেলাম যদি আঘাতটা আমার পেটে লাগতো তাহলে হয়তো আমার সন্তানটাকে পেতাম না। আমার শাড়ি ছিড়ে গেছে তাতে কি হয়েছে, নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি এটাই আমার সান্ত্বনা। সাহস করে আজো আমার স্বামীকে এ কথা বলতে পারিনি। তার কথা অমান্য করেই হয়তো এমন দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। তাকে বললে হয়তো আমার মনের ভেতরে যে অপরাধ বোধ কাজ করছে তা কিছুটা হলেও কমতো।

বগুড়া থেকে

পঞ্চব্যঞ্জন

– মম

ঘটনা এক. স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় ঝাড়ুদারের স্ত্রীর ভূমিকায় আমি। তখন ছিলাম ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। বড় বোন ভালো করে শাড়ি পরিয়ে দিলেন। কিন্তু অনভ্যাসের কারণে দর্শকদের সামনে যখন মাঠ ঝাড়ু দিচ্ছি তখনই ঘটলো অঘটনটা। সামনের দিকে পায়ের কাছে ঝুলন্ত শাড়ির অংশ পায়ের নিচে চাপা পড়লো। আমি তা খেয়াল করিনি। যেই সামনে পা বাড়ালাম, শাড়ির চাপা পড়া অংশে টান লেগে শাড়ি খুলে গেল। আমার পরনে শাড়ির নিচে পাজামা, হাফপ্যান্ট বা জাঙ্গিয়া কিছুই ছিল না। শুরু হলো দর্শকদের মাঝে হাসি। সে হাসি যেন আর থামতে চায় না। এদিকে তখন কাদতে শুরু করেছি ভ্যা ভ্যা করে। তখন স্যার এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন।

ঘটনা দুই. স্কুলে একজন মন্ত্রী আসবেন। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জানাতে আমাদেরকে স্কুল থেকে আধা কিলোমিটার দূর পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে দাড় করানো হলো লাইন সহকারে। আমরা যারা ভালো ছাত্রী এবং যথেষ্ট সুন্দরী ছিলাম তাদেরকে লাইনের প্রথম দিকে রাখা হলো। উল্লেখ্য সব ছাত্রছাত্রী স্কুল ড্রেস পরে এসেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম আমি ও আমার বান্ধবী নীলা। দুজনেরই পরনে শাড়ি। ফিজিকাল টিচার অবশ্য এ জন্য কিছু বলেননি। কিন্তু লাইনে দাড়ানো অবস্থায় সহকারী প্রধান শিক্ষক এলেন আমরা ঠিকমতো দাড়িয়েছি কি না দেখতে। আমাদের দুজনকে শাড়ি পরা দেখে বকাঝকা করে লাইনে থেকে বের করে দিলেন। স্কুলের প্রায় সব ছাত্রছাত্রীর মাঝখান থেকে সেদিন এভাবে অপমানিত হয়ে বের হয়েছিলাম স্রেফ শাড়ি পরার কল্যাণে। অবশ্য দুজন ছিলাম বলে অপমানের ভাগ কিছুটা কম হয়েছিল। ফিফটি ফিফটি!

ঘটনা তিন. এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। এমন সময় বড় আপার বিয়ে ঠিক হলো। গায়ে হলুদে যেতে হবে। তাই দোকানে গেলাম হলুদ শাড়ি কিনতে। এবার শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ, পেটিকোট বানাতে হবে। গেলাম দর্জির দোকানে। কাপড় কেনা হলো। মাপ দিতে হবে। কিন্তু

ব্লাউজের মাপ নিতে দর্জি লোকটি এতো দেরি করছে কেন? লক্ষ্য করলাম, মাপ নেয়ার সময় সে ইচ্ছাকৃতভাবেই আমার বুক স্পর্শ করছে। তাছাড়া স্তনের বোটায় ওর হাতের খানিকটা চাপও অনুভব করলাম। স্তনের ওপরে মাপ সে তিনবারে নিল। স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম সে ইচ্ছা করে আমার স্তন ও বুকে হাত লাগানোর জন্য তিনবার মাপ নিল। তখন ইচ্ছা করছিল, থাপ্পড় মেরে...। কিন্তু পারিনি। জানি না এ বয়সী সকল মেয়েই শাড়ি পরার আয়োজন করতে গিয়ে এ ধরনের সমস্যায় পড়ে কি না।

ঘটনা চার. এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের নবীনবরণ। সেই অনুষ্ঠানে আসবেন স্থানীয় এমপি যিনি একজন প্রতিমন্ত্রী। ওনার আগমনের প্রতীক্ষায় কলেজের পক্ষ থেকে আমরা বিশজন মেয়ে হলুদ শাড়ি পরে ফুল নিয়ে দাড়িয়ে আছি। মন্ত্রী এলেন, ছাত্রনেতা ও কর্মীরা শুরু করলেন *অমুক ভাইয়ের আগমন*...ইত্যাদি। আমরা ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিলাম। মন্ত্রীর সামনে এগোতেই আমরা কয়েকজন মেয়ে পড়ে গেলাম ভিড়ের মধ্যে। তখন কে যেন (সম্ভবত কোনো অসভ্য ইচ্ছা করেই) আমার শাড়ির আচল ধরে দিল হেচকা টান। ঘুরে পড়ে গেলাম মাটিতে। কোমর পর্যন্ত শাড়ি খুলে গেল। বান্ধবীরা আমাকে ঘিরে ধরলো। তারপর তুলে নিয়ে গেল কমনরুমে। সেদিন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সামনে অধ্যক্ষ ঘোষণা দিলেন, যে করেই হোক এ ঘটনার বিচার হবেই। কিন্তু ঘোষণা ঘোষণাই রয়ে গেল। আর সামনে এগোলো না।

ঘটনা পাচ. এইচএসসি পাসের পর অভিভাবকরা বিয়ে দিলে দিলেন। টুকটুকে লাল শাড়ি পরে বাসরঘরে গেলাম। শুরু হলো আমার নতুন এক জীবন। এখন স্বামীর সঙ্গে শুই বলে শাড়িই পরতে হয় প্রতিদিন। কারণ এতে করে আমার স্বামীর পক্ষে সহজেই আমার বুকের মাংসপিণ্ড নিয়ে খেলা করা সম্ভব হয়। তাছাড়া বুক থেকে হাত যখন আস্তে আস্তে নিচের নাভির দিকে কিংবা আরো নিচে নামাতে ও তৎপর তখন শাড়িই ওর কাছে সুবিধাজনক মনে হয়। এক টানে শাড়ি খুলে ও আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে আর দক্ষ কৃষকের মতো আমার উর্বর জমিনে চাষ করে বেড়ায়। সে শুধু সুখ আর সুখ...! সুখের অবগাহন।

শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

প্রতিযোগিতা

– শারমিন খায়ের সূচনা

জীবনে আমি প্রথম শাড়ি পরি অভিনয় করতে গিয়ে। ১৯৯৭ সাল। তখন আমার বয়স মাত্র সাত বছর। আমার মামা সংস্কৃতিমনা মানুষ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। আমাকে অভিনয়, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি শেখাতেন। যদিও তখন অভিনয় খুব একটা ভালো পারতাম না। তাই মামা আবৃত্তিটাই আমাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে শেখাতেন। মামা একদিন একটা একক অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে মুখস্ত করতে বললেন। স্ক্রিপ্টটা ভালোভাবে মুখস্ত করে মামাকে শোনালাম। মামা বললেন, এই স্ক্রিপ্ট একটা একক অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট এবং এটাই আমাকে অভিনয় করতে হবে।

খুবই খুশি হয়েছিলাম। কারণ আমি মঞ্চে অভিনয় করবো এবং সবাই আমাকে দেখবে। আমার মনে হলো, মঞ্চে অভিনয় করতে ভয় লাগবে না। কেননা অনেকবার মঞ্চে আবৃত্তি করেছি। তাই খুব সহজেই মামার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মা বেকে বসলেন। পরে অনেক কষ্টে মামা, আমি আর আব্বু মিলে মাকে রাজি করালাম।

এমনিতে বাবা সব ব্যাপারেই আমার আর মামার পক্ষ নেন। তাই সব কিছু সহজ হয়ে গেল। অভিনয়টা ছিল একজন ঝগড়াটে শাশুড়ির যে কি না বৌকে যৌতুকের জন্য প্রতিদিন গালমন্দ করে এবং তাকে মারধর করে। বাসায় অভিনয় অনুশীলন করার সময় আমার গায়ে পরা থাকতো ফ্রক আর হাফপ্যান্ট। তখন এ পোশাক খুবই সহজ ছিল, কোনো কষ্ট হয়নি। যখনই মা আমাকে বললেন, অভিনয়টা শাড়ি পরে করতে হবে শুনে সেই সময় মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, ওকে শাড়ি পরিয়ে দেবে কে?

তখন মামা বললেন, কেন আপা, তুমি পরাবে।

মা চিৎকার করে ঘর মাথায় তুললেন। তুই আমাকে আগে বলবি না? আমিই শাড়ি পরতে পারি না। তুই তো সবই জানিস, তবুও কেন আমাকে বলছিস।

মা আমার প্রচণ্ড রাগী। বাসার সবাই মাকে খুব ভয় পায়। মায়ের এসব কথা শোনার পর মামার আর সাহস হলো না তার সঙ্গে কথা বলার। বাবা খুব করে মাকে বোঝালেন। মা রেগে গিয়ে বললেন, তুমি জান না, আমি শাড়ি পরতে পারি না, মেয়েকে পরাবো কিভাবে? তাছাড়া ঘরে শাদা শাড়িও নেই।

মামা বললেন, শাদা শাড়ির ব্যবস্থা আমিই করবো, আমিই পরাবো।

তখন মা বললেন, সূচনা, শাড়ি পরে অভিনয় করতে পারবে তো? তাও আবার ঝগড়ার? এমনিতে সে খুব ঝগড়াটে, তার ওপর আবার ঝগড়ার অভিনয়, অভিনয় করতে গিয়ে শাড়ি খুলে গেলে আর অভিনয় করতে হবে না।

মায়ের কথা শুনে মামার মাথায় যেন বাজ পড়লো। দেখতে দেখতে অভিনয় প্রতিযোগিতার সময়ও এসে গেল।

অভিনয় প্রতিযোগিতার আগের দিন ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। আবৃত্তিতে বরাবরই আমার অবস্থান ভালো থাকে। পরদিন দুরুদুরু বুকে অভিনয় প্রতিযোগিতার নির্ধারিত স্থানে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কিন্তু শাড়ি পরাবেটা কে? বাসা থেকে পরে আসিনি। আমার মামাও শাড়ি পরাতে পারে না। আমার কেমন জানি একটু ভয় লাগছিল। এখন শাড়ি পরাবেটা কে? আমিও শাড়ি পরে অভিনয় করতে পারবো কি না জানি না। পরে মামার এক ছাত্রীর অভিভাবক আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিলেন। সেই আমার জীবনে প্রথম শাড়ি পরা। সেদিনই আমার জীবনে প্রথম অভিনয় করা এবং অভিনয়ে প্রথম পুরস্কার পাওয়া। যে শাড়ি পরে খুব বিব্রত হয়েছিলাম, পরে সেই শাড়ি পরেই পুরস্কার নিয়ে খুব আনন্দ করেছিলাম। ঢাকার চেয়ে আমি নারায়ণগঞ্জেই অনুষ্ঠান বেশি করি। কারণ সেখানে মামা থাকেন। মামার জন্যই এসব হয়েছে। এভাবেই জীবনে প্রথম শাড়ি পরা, শাড়ি পরে বিব্রত ও আনন্দিত হওয়া এবং পুরস্কার জেতা।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

কুমন্ত্রণা

– মুহাম্মদ খয়রাত হুসেইন রতন

শাড়ি বাঙালি ললনাদের একটি অতি প্রিয় পোশাক। রাজ্যের যতো শাড়ি আছে সব যদি কোনো নারীকে দেয়া যায় তবুও সে হয়তো বলবে, *আমার আর ক'টা আছে? শাড়ি আছে অমুকের মায়ের।* ছেলেরা একে অন্যের প্যান্ট বা শার্ট সাধারণত ব্যবহার করে না। করলেও স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। এক্ষেত্রে নারীরা একটু ভিন্ন। পাঠকবৃন্দ আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। কথায় আছে, যত মত তত পথ। আমার লেখার বিষয়বস্তু এটা নয়। আমার বিষয় হচ্ছে এই শাড়ি নামে বস্তুটি কি করে আমাকে ও আমার গিন্নিকে চোদ্দ শিকের ঘরে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

ঘটনাটি এ রকম – আমরা দুজনেই কর্মজীবী মানুষ। সংসারের প্রয়োজনে দুজনকেই ঘরের বাইরে কাজ করতে হয়। সেই সুবাদে বাসায় কাজ করার জন্য বরাবরই একটি কাজের মেয়ে রাখতে হয়। এর আগেও বাসায় কাজের মেয়ে ছিল এবং তাকে আমরা নিজের বাড়িতে রেখে বিয়ে দিয়েছি, বর্তমানে সে এক সন্তানের মা। কাজের মেয়ে রাখার ব্যাপারে আমি বা আমার গিন্নি দুজনেই সচেতন থাকি। তারপরও ঘটনা ঘটে গেল।

বছরটি ছিল ১৯৯৬ সাল আমরা দুজনেই যথারীতি কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতির প্রাক্কালে কাজের মেয়েটির গিন্নির ব্যাগ থেকে আলমারির চাবিটি হাত সাফাই করে ফেলে। আর তারই বদৌলতে সে আলমারিতে যতো শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট ছিল সব সাফ করে বাড়ি থেকে সরে পড়ে। এবং তাও আবার দিনের আলোয়। বাসার আশপাশের লোকজন অনেকেই তার যাওয়াটা দেখেছে কিন্তু কেউই তখন বুঝতে পারনি তার এ যাওয়াটি স্বাভাবিক নয়। সে আমার গিন্নির শাড়ি কাপড় পরে হাতে ব্যাগ নিয়ে এমনভাবে বের হয়েছে, তাতে করে কারো মনে কোনো রকম সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। আমরা কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে সব কিছু দেখে তার বাবা ও ভাইকে বিষয়টি জানাই এবং কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ করি। নিজেও সম্ভাব্য জায়গায় খোজখবর নিই। সেই সঙ্গে থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করি।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। কিন্তু মেয়েটির কোনো সন্ধান পাই না। প্রথম থেকেই কেন জানি মনে হয়েছিল এই ঘটনার পেছনে মেয়েটির পরিবার জড়িত আছে। কারণ যার মেয়ে সে বা তার বাড়ির লোকজন ছিল বেশ শান্ত। মাস খানেক পরেও যখন কোনো প্রকার খোজ পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যায়, কোনো পথ পাচ্ছিলাম না। এই যখন অবস্থা সে রকম সময়ে স্থানীয় এক আওয়ামী নেতার ভাইয়ের কুমন্ত্রণায় মেয়েটির বাবা ও ভাই থানায় যায় কেস করার জন্য। কিন্তু আগেই ডায়রি করে রাখার কারণে থানা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় এবং পরামর্শ দেয় মেয়েকে খুজে বের করার জন্য। এতেও তারা হাল না ছেড়ে কোর্টে কেস করে। তবে *রাখে আল্লাহ মারে কে।*

সেদিন ছিল বিএ পরীক্ষা। বিচারক ব্যস্ত ছিলেন পরীক্ষার দায়িত্ব পালনে। সে কারণে কোর্ট বসে বিকেলে। এ জন্য মূল উকিল তার সহকারীকে কেসগুলো মুভ করতে বলে চলে আসেন। সহকারী

উকিল নথির পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থমকে দাড়ান। কেননা তিনি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে হেরে যান এবং সিদ্ধান্ত নেন এই কেসটি কিভাবে তামাদি করা যায়।

যেই চিন্তা সেই কাজ। সে তার কয়েকজন বন্ধু মিলে বাদী পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং কোর্ট চত্বর থেকে চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। অথবা তাদের বিরুদ্ধে উল্টো ঘটনা ঘটাবেন বলে ধমক দেন। যথারীতি কেস কোর্টে ওঠে। কিন্তু বাদীপক্ষ না থাকার কারণে কেসটি তামাদি হয়ে যায়। বিচারক কেসটি নথিভুক্ত করা হোক মর্মে রায় দেন। এটা সম্ভব হয়েছিল যে সহকারী উকিলটি কেসটি মুভ করছিলেন তার বাড়িটি ছিল আমার পাড়াতেই। সে সুবাদে সে সব ঘটনা জানতো এবং সে চায়নি নারী নির্যাতনের মতো একটি আইনে আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে মিথ্যা কেসে জড়িয়ে পড়ি। এখানে ধন্যবাদ জানাই তার মহান পেশাকে। কারণ তিনি পেশার মর্যাদা রেখেছেন, অমর্যাদা করেননি।

কথায় আছে, ভাগ্যবানের বোঝা নাকি সৃষ্টিকর্তা নিজে বয়ে বেড়ান। প্রায় মাস তিনেক পর একদিন সকালে প্রতিবেশীর ডাকে ঘুম থেকে উঠি এবং দেখি একলোক এই পাড়ার কোনো মেয়ে পালিয়ে গেছে কি না তা খুজে ফিরছেন। জানতে পারি লোকটি এসেছে হারাগাছ থেকে। সেখানকার লোকজনের ধারণা এ মেয়ে নিশ্চয়ই কোনো স্বচ্ছল ঘরের অদুরে মেয়ে, রাগ করে হয়তো বাড়ি ছেড়ে এসে ভুল করেছে, এবং নিজেও সে তাই বলেছে, সৎ মায়ের কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এরপরও কি কারো বিশ্বাস না করে উপায় আছে? কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বলছে, সৎ মায়েরা এ রকমই হয়। তারা মেয়েটিকে যার কাছ আটক করেছে সে ছিল মূলত দুই নাম্বারি মেয়ে। শুধু পরনের কাপড়-চোপড় দেখে এলাকার লোকজন মেয়েটির নিজেদের হেফাজতে রাখে এবং অনেক কষ্ট করে শুধু আমার পাড়ার নামটি উদ্ধার করে। সে মোতাবেক সেখানকার নয়া মিঞা নামে একজনকে পাঠায় খোজ নেয়ার জন্য। নয়া মিঞা প্রতি মাসেই ডায়বেটিস চেক করানোর জন্য দিনাজপুর ডায়বেটিস হাসপাতালে আসেন। সেই সুবাদে তার দিনাজপুর আসা ও খোজ নেয়া। সেখান থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এসে থানায় দিই এবং থানার পরামর্শে মেয়েটিকে তার বাবার হাতে তুলে দিই।

সত্য দিনের মতোই সত্য আর সৎ পথের উপার্জন যে নষ্ট হয় না তারও প্রমাণ পেলাম। কোনো কাপড় খোয়া যায়নি। মোটামুটি সব কিছু ফেরত পেয়েছি। এবং সেই সঙ্গে আরো প্রমাণ হয়েছে, আমি বা আমার পরিবারের লোকজন মিথ্যা বলিনি। যখন ঘটনাটি ঘটে তখন অনেকেই বলেছিল নিয়ে গেছে হয়তো একটা, বলছে দশটা।

এখানে আর কাপড়ের পরিমাণ জানালাম না। পরে জানতে পেরেছি মেয়েটি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিল তার মায়ের কুমন্ত্রণায়।

ছোট গুড়গোলা, দিনাজপুর থেকে

নকল

– তোফায়েল আহমেদ তানজীর

১৯৯৮ সালের ঘটনা। এসএসসি পরীক্ষা চলছে। সেদিন ছিল গণিত পরীক্ষা। যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। ঠিক পাচ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল প্রশ্ন নিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে, কে কার আগে প্রশ্ন বের করে নিয়ে যাবে। একটু পরে এক বাবাকে দেখলাম তার ছেলের জন্য অনেকগুলো নকল বয়ে এনে উচু দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কর্তব্যরত পুলিশ তার দিকে তেড়ে এলো, তখন পুলিশকে কিছু ধরিয়ে দিতেই ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে অন্যদিকে চলে গেল।

লোকটি খুশি মনে তার ছেলেকে নকলগুলো দিয়ে বললো, জিতু, আর কিছু লাগবে?

উত্তরে ছেলেটি বললো, পাচ নাম্বারেরটি নিয়ে এসো বাবা।

হায়রে বাবা!

ছাত্রীদের হলে আরো মজার দৃশ্য দেখা গেল। যে শাড়ি বাংলার লজ্জাবতী নারীদের ঐতিহ্য বহন করে, সবাই সে শাড়ি পরে পরীক্ষা দিচ্ছে। কারণ শাড়ি পরে পরীক্ষা দিলে নাকি প্রয়োজনে নকল লুকাতে খুবই সুবিধা হয়। এরই মধ্যে একটি মেয়ে দৌড়ে পরীক্ষা রুমের বাইরে গিয়ে কাকে যেন ডাকছে নকলের জন্য। তার কাঙ্ক্ষিত লোকটি দেয়ালে উঠে কিছু নকল ধরিয়ে দিতেই মেয়েটি নকল নিয়ে দৌড় দিল। ছেলেটি পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো, শাড়ি খুইল্লা গেছে।

মেয়েটি তাৎক্ষণিক উত্তর দিল, নিচে পেটিকোট আছে।

পাশের ছাত্র হল থেকে চিৎকার করে এক ছাত্র স্যারের কাছে নকল চাইছে। স্যার বললেন, এই আস্তে বল, ম্যাজিস্ট্রেট শুনতে পাবে।

ছাত্র রেগে গিয়ে বললো, *কেন, ফরম ফিল আপের সময় তিন হাজার দুইশ টাকা দিছি না? তখন তো ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুস দেবেন বইল্লাই বেশি টাকা নিছেন।*

এই হচ্ছে পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষুদ্র একটি চিত্র। হায়রে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা! নকলকারী, সরবরাহকারী বাবা, সাহায্যকারী শিক্ষক, নকল আনতে গিয়ে শাড়ি খুলে যাওয়া মেয়েটির মতো কারোরই কি লজ্জা নেই? নাকি মেয়েটির মতো নিচে পেটিকোট আছে বলে সবাই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। যাযাদির তো ছোট বড় অগণিত পাঠক। আসুন না, আমরা নিজেরাই নকল প্রতিরোধে সচেষ্ট হই। এ প্রতিরোধের শাড়ি দিয়েই ঢেকে দিই বাংলা মায়ের লজ্জা।

কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা থেকে

মরিচা বোম

– সীমান্ত

আমাদের সময়টাই ছিল ভিন্ন। ভিসিআর সবেমাত্র মহল্লায় প্রবেশ করেছে। ডিশ কি জিনিস নামই শুনিনি। স্কুল ছুটির পর সারাদিন শুধু দামাল ছেলেদের মতো ছোটাছুটি করতাম। এক বাড়ির আম খাও তো অন্য বাড়ির পেয়ারা চুরি। ঘুড়ির সময় সুতা মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি উড়াও। বর্ষার সময় বৃষ্টির

দিনে ছোট–বড় সবাই মিলে ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়। সিগারেটের খালি প্যাকেট, ফায়ারবক্সের খোল, মার্বল ইত্যাদি পয়সা দিয়ে খেলা। আর কতো কি করতাম। আমাদের দিন এভাবেই কাটতো। সে সময় ঈদসহ অন্য উৎসবগুলোতে খুব আনন্দ করতাম। শবেবরাত যদিও কোনো উৎসব নয়, তবুও শবেবরাত আমাদের কর্মক্ষমতা দেখানোর উৎসব নিয়ে আসতো। শবেবরাত আসার পনেরো দিন আগে থেকেই মহল্লায় চলতো বোমাবাজি। *রকেট বোম, সলতা বোম, কাঠি বোম, কুপি বোম, ব্যাঙ বোম* আর *মরিচা বোম* ছিল উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বোমা ফুটতো সমানে। বোমাবাজির উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শবেবরাতের রাতে বিভিন্ন মহল্লায় ছেলেদের মধ্যে মরিচা বোমের সাহায্যে যুদ্ধ খেলা। অনেকেই হয়তো জানে যে, মরিচা বোম এক চমৎকার বোমা। বোমাটি দেখতে মরিচের মতো। বোমের মাথায় আগুন দিলেই এটি আগুনের ফুলকি বের করতে করতে এদিক–ওদিক প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে এবং এক সময় সাই করে আকাশের দিকে উড়ে যায়।

এমনি এক শবেবরাতের সময় বন্ধু মহলে নিজের কর্মক্ষমতা দেখানোর সুযোগ এলো। লেগে গেলাম মরিচা বোম বানানোর কাজে। স্কুল ছুটির পর বাসায় এসেই বড়ই গাছের ডাল কেটে পুড়িয়ে কয়লা পাউডার বানালাম। কারওয়ান বাজার থেকে আনলাম গন্ধক, সোডা এবং পটাশ। কসাইয়ের দোকান থেকে গরুর ক্ষুদ্রান্ত্র এনে ফুলিয়ে শুকিয়ে বানালাম জিল্লি। সবগুলো উপকরণ খুব হিসাব করে মেশাতে হয়। তা না হলে বোমা ভালো হবে না। দুপুরবেলা সবাই যখন বিছানায় ঘুমাচ্ছিল তখন বোমার মসল্লা বের করে পরীক্ষা করার পালা। ঘরের মধ্যেই একটি বোমাতে দিলাম আগুন আর যায় কোথায়, বোমা এদিক–ওদিক দৌড়াচ্ছে এবং হঠাৎ করে এক সময় দিল উড়াল।

ঘরের মধ্যে তারে টাঙানো ছিল আম্মার শাড়ি। বোমা কি আর শাড়ি চেনে? সোজা শাড়ির মাঝখান দিয়ে শাড়ি ভেদ করে উড়াল। যা হবার তাই হলো। শাড়ির মাঝখানে গোল গর্ত করে আগুনে পুড়ে গেল। আমি তো ভয়ে শেষ। ঘরের মধ্যে বারুদের গন্ধ। আম্মা ঘুম থেকে উঠে গেলেন। আমি দরজা দিয়ে সোজা দৌড়। সন্ধ্যায় ভয়ে ভয়ে বাসায় এলাম। দেখি আম্মা কিছুই বলছেন না। চুপচাপ বই নিয়ে পড়তে বসলাম। একটু পরেই মা জননী বেত নিয়ে এলেন। বেত মেরে ওনার কর্মক্ষমতাও দেখালেন আমাকে। শরীরে একে দিলেন রেললাইনের মতো দাগ।

সেই থেকে শবেবরাত এলেই আমার মায়ের শাড়ি পুড়িয়ে ফেলার কথা মনে পড়ে, সঙ্গে বেত খাওয়াও।

ঢাকা থেকে
shimant9@hotmail.com

আপোস

– দুলাল

বৌপিয়াসী সোহেল ঢাকায় চাকরি করে। সপ্তাহের পঞ্চম দিন থেকেই বৌয়ের জন্য কাটাফাটা হৃদয় উকিঝুকি দিতে থাকে কবে আসবে ছুটির সেই দিন। গত সপ্তাহে শ্যালক এসেছিল বেড়াতে। তাই বাড়ি যাওয়া হয়নি তার। বৌয়ের ভালোবাসা কতো যে তীব্র তা এক সপ্তাহ বিরতিতেই স্পষ্ট বোঝা

যায়। শ্যালক প্রস্থানকালে বৌয়ের জন্য কিনেছে এক শাড়ি। বলেছে তোর বোনের জন্য এ কাপড়টা গিয়েই হাত বদল করিস। শ্যালক বাড়ি গিয়েই তার বোনকে শাড়িটা পৌছে দেয়। বেচারার শ্বশুর নেই। ঘরজামাই মনেই ওই বাড়িতে থাকে। গ্রামে বিচ্ছিন্ন এক বাড়ি।

সময়ের চাকা ঘুরে এলো ছুটির দিন। সোহেল বাড়ি এলো। তার স্ত্রী গেছে পাড়া বেড়াতে। শ্যালকও বাড়িতে নেই। নতুন শাড়ি পেয়ে শাশুড়ির মনে পড়ে যায় পচিশ বছর আগের রঙিন স্মৃতিগুলো। নিজেকে সামাল দিতে না পেরে সেই শাড়ি পরে নিজের স্মৃতিগুলো বরণ করে নেয়। মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে দুয়ার ঝাড়ু দেয়। এটা সন্ধ্যার আগ মুহূর্তের দৃশ্য। সোহেল সেই সময় বাড়িতে পৌছে। তার নিজের কেনা শাড়ি চিনতে অসুবিধা হয় না। নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে শাশুড়িকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেই একটানা কিস দেয় নরম গালে। শাশুড়ি লজ্জায় দৌড়ে ঘরে চলে যায়।

শাড়ি বদলে এবার শাশুড়ি রান্নাঘরে ঢোকে। বোকা কিসিমের সোহেল পেছন থেকে তার শাশুড়িকে দেখে মনে করে হয়তো তার স্ত্রী তাকে খেয়াল না করেই রান্নাঘরে ঢুকেছে। এক পা, দুই পা করে সোহেলও রান্নাঘরে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে পেছন থেকে শাশুড়ির নরম স্ফীত অংশে দুই হাতে চেপে ধরে বলে, ওটা যে আম্মা পরবে তা কি আমি জানতাম? ওই শাড়িটাই তো আমার সকল কামনার সাড়া জাগিয়েছে নিঃসন্দেহে। তোমার অনুপস্থিতি কি আমার এক মুহূর্ত সহ্য হয়। তোমাকে আমি ঢাকা নিয়ে যাবো পরের বার এসেই।

কথাগুলো বলা সবেমাত্র শেষ। অমনি শাশুড়ি পেছন ফিরে তাকায়। সোহেল বিদ্যুতের শক খায়। ছিটকে পড়ে দূরে।

সোহেলের স্ত্রী এসে শেষ দৃশ্যটা দেখে। মনে সন্দেহ বাধে স্বামীর চরিত্র নিয়ে। দৌড়ে ঘরে যেতেই দেখে অগোছালো শাড়ি। ঘৃণা জাগে তার মায়ের প্রতি। সে এমন করতে পারলো। ছিঃ, ছিঃ মা, ছিঃ।

সোহেল এতোক্ষণে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে চলে আসে নিজের বাড়ি। তার আর স্ত্রী সঙ্গে থাকা হলো না ওই দিন। মনে মনে সোহেল ভাবতে থাকে, হায়রে শাড়ি, তুমি আমাকে এমন একটা নিচু মানের অপমান করতে পারলে? আমি সুখের আশায় শাড়ি কিনেছিলাম।

পরে খোজ নিয়ে জানা গেছে আপোস হয়েছে। আসলে সবই ঘটেছে ভুল থেকে। আপনারা কিন্তু সোহেলের মতো ভুল করবেন না। হাতে একটু সময় রাখবেন, যাতে ভাবনার পরে কর্ম ঘটে, আগে নয়।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

কান্না

– পবন

ক্লাস ফাইভে পড়তাম। সেই সময় বড় বোনের বিয়ে হলো। সারা বাড়িতে চললো আনন্দ–উৎসব। বড়আপু সুন্দর লাল বিয়ের শাড়ি পরেছিলেন। মাথায় লাল ওড়না ছিল। ওড়নাতে ছোট ছোট কাচ

বসানো ছিল। আমি মনে করতাম এগুলো মতি–পান্না। বিয়ের পর আপু চলে গেলেন। বাড়িতে আনন্দ উৎসব কমে এলো। আমি আম্মুর কাছে বায়না ধরলাম এ রকম শাড়ি পরবো। আম্মু রাজি হচ্ছিলেন না। আমি কাদতে লাগলাম।

আম্মু বললেন, এগুলো বিয়ের সময় পরতে হয়।

বললাম, বিয়ে করবো।

তখন বিয়ে কি বুঝতাম না। তবে বুঝলাম রাজি হলে শাড়ি তো পাওয়া যাবে। কারণ আপুকে এই সব শাড়িতে খুব ভালো লাগছিল। আম্মু তো হেসেই খুন। হাসি যেন আর থামতে চায় না। আমার কান্নার গতি বেড়েই চললো। এমন সময় আব্বা এলেন অফিস থেকে। আম্মুর মুখে আমার কথা শুনে তিনিও হাসতে লাগলেন। আমার কান্না এবার সপ্তমে পৌছালো।

আব্বু হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমাকে কোলে নিলেন। বললেন, লক্ষ্মী সোনা, ওই সব শাড়ি পড়লে তো আমাদের ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে। তুমি কি তোমার আপুর মতো আমাদের ছেড়ে যাবে?

আমি কথা শুনে কান্না থামিয়ে দিলাম। মাথায় ঝড় বয়ে চললো। আব্বু আম্মুকে ছেড়ে থাকতে হবে শুনে মাথা নষ্ট হওয়ার জোগাড়। আব্বু–আম্মু যদি শাড়ি দিতে রাজি হয়ে যান তাহলে আমার কি হবে ভেবে তাড়াতাড়ি বললাম, আমার ওই শাড়ি লাগবে না। তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না কোনোদিন।

আব্বু–আম্মুর গলা জড়িয়ে ধরে অন্য রকমভাবে কাদলাম।

বিয়ে বাড়ি। সবাই ব্যস্ত। লোকজন গিজ গিজ করছে। আমি বৌ সেজে বসে আছি। পরেছি বিয়ের ঝলমলে শাড়ি ও মাথায় ওড়না। সবাই দেখছে আর বলছে, একেবারে পরীর মতো। আমার খুব লজ্জা লাগছিল। বিয়ের পর আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গাড়িতে উঠবো। আব্বু–আম্মুর কাছে গেলাম। যে আব্বু–আম্মুর মুখে মুচকি হাসি ছিল সেখানে কেমন এক হারানোর বেদনা। দুই চোখে টলমলে অশ্রু।

আব্বু অশ্রু লুকানোর চেষ্টা করে বললেন, লক্ষ্মী সোনা, তোমাকে শাড়িতে খুব সুন্দর লাগছে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাদলাম। তারপর গাড়িতে করে চলে গেলাম।

মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী থেকে

অর্ধেক

– এনাম

অনেক দিন আগের কথা। তখন সবেমাত্র ক্লাস নাইনে উঠেছি। বাবা মায়ের ইচ্ছায় বিজ্ঞান বিভাগ নিয়েছিলাম, ক্লাসে সব সময় দুষ্টুমি করলেও বাসায় ছিলাম লক্ষ্মী ছেলের মতো। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সেটা দুষ্টুমি ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকতো। যেহেতু আমাদের ক্লাসে

ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে ক্লাস করতাম, তাই দূর থেকে মেয়েদের দেখতাম। আমার কাজিন লোপাআপা ছিলেন খুব সুন্দরী। সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার মেয়ে লোপাআপা সবেমাত্র রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন। সুন্দরী হওয়াতে লোপাআপার প্রত্যেক পদক্ষেপ খালা খালু লক্ষ্য রাখতেন। এতো বড় মেয়েকে ইউনিভার্সিটিতে দিয়ে ও নিয়ে আসার কাজটা কখনো খালু, কখনো খালা নিজে করতেন।

আমি বেড়াতে যাওয়াতে সে দায়িত্বটা কদিনের জন্য আমার ওপর পড়লো। আমি যেহেতু ছোট সে জন্য লোপাআপার সঙ্গেই ঘুমাতাম। ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার ফলে আপার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আপাকে কে কখন চিঠি দিয়েছে, ফুল দিয়েছে, চিঠির ভাষা ইত্যাদি সব বলতেন। আর বলতেন, তুই তো এখনো ছোট, ওসব বুঝবি না।

মাঝে মধ্যে রিকশায় বসে আপা এমন সব কথা বলতেন যে আমার লজ্জা লাগতো। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলে আমার হাত ধরে টান দিতেন, ইচ্ছা করেই গায়ে লেগে যেতো। রাতে এক সঙ্গে ঘুমাতাম তাই অনেক সময় লোপাআপা আমার সঙ্গে এক কাথার নিচেই ঢুকে পড়তেন। আমার গায়ে লেগে থাকতেন। মাঝে মধ্যে আপার হাতটা আমার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করতো। আমি ইচ্ছা করেই সরিয়ে দিতাম।

ধীরে ধীরে লোপাআপাকে আমার আরো ভালো লেগে যেতে লাগলো। আপাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছে হতো। একদিন লোপাআপার এক বান্ধবীর বিয়ে হবে। তাই বিয়েতে যাওয়ার জন্য আপা খুব সুন্দর করে সেজেছেন গরদের শাড়ি পরে। আপাকে দেখতে এতো সুন্দর লাগছিল যেন কোনো রাজকন্যা আমার সামনে দাড়িয়ে আছে। আপাকে বললাম, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। শাড়ি পরাতে আপার নাভিটাও দেখা যাচ্ছিল। মুখ ফসকে বললাম, আপা! তোমার নাভিটা এতো সুন্দর।

আপা এসে আমার নাক টিপে বললেন, তাই নাকি, আমার কাছে এর চেয়ে আরো সুন্দর জিনিস আছে, তুই যদি দেখতে চাস আমাকে বলিস।

কিছুক্ষণ পর আপার এক বান্ধবী এসে আপাকে নিয়ে গেলেন। এবং যাওয়ার সময় আপা বললেন, তুই আম্মাকে নিয়ে খেয়ে নিস, আমার আসতে রাত হবে।

রাত দশটার দিকে খাওয়ার পর শুয়ে আছি আর আপার কথা ভাবছি, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। প্রায় সাড়ে দশটার দিকে আপা এলেন। আপাকে দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেললাম এবং ঘুমের ভান করে থাকলাম। আপা দরজা বন্ধ করে আমাকে বারকয়েক ডাকলেন কিন্তু আমি সাড়াশব্দ করলাম না।

আপা এসে আমার ঠোটে চেপে চুমু খেয়ে বললেন, বোকা ছেলে, কিছু বোঝে না। বলেই আপা সরে গেলেন।

চোখ মেলে আপাকে দেখলাম। শাড়ি পরা লোপাআপাকে এখন কোনো পরীর মতো লাগছে।

আপা বললেন কিরে দুষ্টু, এখনো ঘুমাসনি? কানের কাছে এসে বললেন, তোকে বলেছিলাম না? আমার কাছে আরো অনেক সুন্দর জিনিস আছে, দেখবি না?

বললাম, কি আপা, কি আছে?

আপা তখন তার শাড়ির আচলটা সরালেন। আপার আচলের নিচে লুকানো গোপান দুটি পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আপার পাহাড় দুটি আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমার মাথাটা আপার দুই পাহাড়ের মাঝখানে চলে গেল।
আজ আপা একজনের ঘরনী। আর আমি উচ্চতর ডিগ্রি-নিচ্ছি। এখনো আপার সঙ্গে দেখা হলে বলেন কিরে, শাড়ির অর্ধেকটা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিলি, পুরোটা দেখলে কি করবি?

ঢাকা থেকে

গণধোলাই

– শাজু

সকালে মার্কেটে গিয়ে বিভিন্ন শাড়ির দোকানে ঘুরলাম কিন্তু শাড়ি পছন্দ করতে পারছি না। ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছি। শেষমেষ কিনেই ফেললাম নীল কাতান শাড়ি। বাসায় এসে পেছন থেকে ভাবীর চোখ ধরে আস্তে করে শাড়িটা হাতের ওপর রাখলাম। ভাবী তো একেবারে অবাক। শাড়ি কোথায় পেলে?
কিনলাম, তোমার গিফট দিলাম।
শাড়িটা পরে ভাবীকে খুব সুন্দর লাগছিল। ভাবী বললেন, চলো, কাল আমরা পাবনা থেকে ঘুরে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। পাবনায় ভাবীর বাপের বাড়ি।
বললাম, যেতে পারি। কিন্তু শর্ত আছে। তুমি আমার দেয়া শাড়িটা পরবে।
পরের দিন সকালে রওনা হলাম পাবনার উদ্দেশ্যে। বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনিতে বসে আছি। গাড়ি লেট আছে আধ ঘণ্টা। ভাবী বললেন, চকবার খাবেন।
আমি এই তিনশ গজ দূরে একটি দোকান থেকে চকবার কিনে এনে পেছন থেকে আস্তে করে ভাবীর চোখ ধরে হাতে চকবারটা ধরিয়ে দিতেই চিৎকার প্রচণ্ড আওয়াজে চিৎকার, বাচাও বাচাও বলে।
একি? এতো ভাবী না, একই রঙ সেই নীল কাতান শাড়ি পরা, অথচ...।
বুঝলাম এ আমার ভুল। ভাবীর স্থলেই সেই একই রঙ-এর শাড়ি পরে আছে আরেকজন সুন্দরী নারী। আমার এই ভুলটা সেখানকার কয়েকজন বখাটে ছেলে অন্যভাবে নিল। এবং তারই জন্য শুরু হলো গণধোলাই। তার ঘণ্টা দুই পরে আমার জ্ঞান ফিরলো। নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের এক ক্যাবিনে। একি! গায়ে এতো ব্যথা কেন? বুঝলাম একই রঙ-এর সেই নীল কাতান শাড়িই এর জন্য দায়ী।

কোটচাদপুর থেকে

মনে পড়ে

– ইমন

ছোটবেলায় পরীক্ষা শেষ হলেই নানিবাড়ি চলে যেতাম। নানিদের পাড়ায় আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতাম। নানিবাড়ির ঠিক পাশেই একটা কুড়েঘর ছিল। ঘরটা পুনিদের।

সমবয়সী পুনি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। পুনি তার সব ভালো খেলনাগুলো আমায় ধরতে দিতো, বিনিময়ে তার একটাই চাওয়া ছিল তা হলো, একটা শাড়ি। কোনো সুদূর ভবিষ্যতে আমার চাকরি হবে। সেই ভবিষ্যতে একটা শাড়ি পাবার আশ্বাসে পুনি তার অনেক প্রিয় খেলনা আমায় একেবারেই দিয়ে দিয়েছিল।

ক্লাস সিক্সে প্রথম কিস্তি বৃত্তির টাকা পেয়েই আম্মাকে দিয়ে পুনির জন্য একটা শাড়ি কিনলাম। পরীক্ষা শেষ হতেই শাড়ি নিয়ে নানিবাড়ি চলে গেলাম। সামান্য একটা শাড়ি কাউকে এতো আনন্দ দিতে পারে সেদিনের সে পুনিকে না দেখলে আমার কখনোই জানা হতো না। শাড়িটা পরে সে সারা পাড়া ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখালো।

দিন দুয়েক পর পুনি ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিল। অনেক ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া পেতাম না। পুনিকে নিয়ে সবার মধ্যে একটা ফিসফাস শুরু হলো। নানিদের কাজের মেয়ের কাছে জানতে চাইলে সে বললো, *পুনিরে মাইনসে নষ্ট করছে।*

মানুষ কিভাবে মানুষকে নষ্ট করে ঠিক বুঝলাম না। কয়েক দিন পর তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দে একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল। কান্নার শব্দ অনুসরণ করে দৌড় দিলেন নানি। নানিকে অনুসরণ করলাম আমি। পুনিদের ঘরের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি চাতালের একটা বাশের সঙ্গে আমার দেয়া সেই শাড়িটা গলায় পেচিয়ে ঝুলে আছে পুনি।

নিজেকে খুনী মনে হতে লাগলো। আমি শাড়ি না দিলে হয়তো সে মরতো না। বড় হয়ে বুঝেছি। পুনি সেদিন আমার শাড়ি না থাকলেও অন্য কিছু গলায় পেচিয়ে মরতোই। ইদানীং পত্রিকায় মহিমা, ফাহিমাদের খবর পড়ে পুনিকে মনে পড়ে যায়।

দক্ষিণ বড়গাছা, নাটোর থেকে

টক ঝাল মিষ্টি

– রহমান

হঠাৎ করে আব্বা কোনো পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়াই আমার বিয়ের আকদ ব্যবস্থা করে ফেললেন। এবং আকদ হয়ে গেল।

সেদিন ছিল ১৯৭৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ডকটর্স হস্টেল থেকে আত্মীয়স্বজন নিয়ে মেয়ে দেখতে যাওয়া এবং তারপরই বিয়ে। ঠিক করেছিলাম আত্মীয়স্বজন নিয়ে রাতেই হস্টেলে ফিরে আসবো এবং আত্মীয়রা হস্টেলে থাকবেন। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির মুরুব্বিরা আমাদের ছাড়লেন না। বাধ্য হয়ে শহরের কালীবাড়ি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে রাত যাপন করতে হলো। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা। স্থানীয় সামাজিক রেওয়াজ হলো, নববধূকে একটা ভালো গহনা, না হলে নিদেনপক্ষে একটা ভালো শাড়ি না দিয়ে তাকে স্পর্শ করা ঠিক না। খুব তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার জন্য এবং খাওয়া–দাওয়া শেষ করতে রাত বারোটার বেশি হবার ফলে দোকানপাট বন্ধ থাকার জন্য

স্ত্রীকে ওইদিন আর শাড়ি দেয়া হলো না। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল এভাবে থাকা ঠিক হলো না বলে।

এসএসসি পরীক্ষার্থিনী স্ত্রী সালোয়ার কামিজ পরেছে। শাড়ি পরায় তার ইচ্ছা ও মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু আমার যুক্তি হলো সালোয়ার কামিজে বাঙালি মেয়েদের বধূবেশে মানায় না। তাই বাধ্য হয়ে আমার স্ত্রী শাড়ি পরা আরম্ভ করলো মনে কষ্ট নিয়ে এবং সে তার সালোয়ার কামিজ অন্যকে দান করে দিল। সে খোটা এখনো এতো বছর পরেও আমাকে হজম করতে হচ্ছে। তার পুরনো রাগ আর অভিযোগ রয়েই গেছে।

প্রথম সন্তান জন্ম নেয়ার পর আমার স্ত্রীকে আমার আব্বা একটা শাড়ি দিলেন। পুত্রবধূকে বাচ্চা হবার পর শাড়ি দিতে হয়। এটা নিয়ম। কিন্তু আব্বা অতো চয়েস করে পুত্রবধূর জন্য সঠিক শাড়ি কিনতে পারেননি বলে সে শাড়ি দুই একদিন পরার পরে স্ত্রী আর পরার আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

১৯৮২ সালে থাইল্যান্ড গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমার স্ত্রীর জন্য একটি শাড়ি কিনেছিলাম এবং ওটাই ছিল থাইল্যান্ড থেকে আনা একমাত্র শাড়ি। আর কারো জন্য কোনো শাড়ি আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শ্যালিকার জন্য শাড়ি না আনায় আমাকে কিছু টক ঝাল কথা শুনতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে ঢাকার মার্কেট থেকে তার জন্য একটি শাড়ি কিনে তখনকার মতো খোটা থেকে পরিত্রাণ পেলাম।

বিয়ের পর প্রতি বিয়েবার্ষিকীতে শুধু ভালোলাগার জন্য এবং মনে রাখার জন্য স্ত্রীকে একটা করে শাড়ি প্রেজেন্ট করতাম। সেও আমাকে শার্ট বা অন্য কিছু প্রেজেন্ট করতো। আগে আমার পছন্দমত শাড়ি কিনলে আমার স্ত্রী সেটা খুব আনন্দ চিত্তে নিতো। গত বছর বেশ ভালো দাম দিয়ে একটা শাড়ি কিনলাম তাকে সঙ্গে না নিয়ে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য। কিন্তু শাড়ি আনার পর সে ভালোমন্দ কিছুই বলেনি, পরেও দেখেনি। পরে তার ভাবীকে নিয়ে শাড়িটা বদলিয়ে নিয়ে এসেছে দোকান থেকে এবং আমাকে দেখায়নি শাড়িটার চেহারা। তাই তার জন্য শাড়ি কেনার আগ্রহ ও আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেছি। তবুও ওকে যেহেতু খুব ভালোবাসি তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে ওর শাড়ি ওকে নিয়েই পছন্দ করে কিনবো।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

আচার সমাচার

– উনম হাবিবা স্বপ্না

পূর্ব প্রণয়ের সূত্রে হঠাৎ করেই নিতান্ত শাদামাটাভাবে আমাদের পরিণয়টা সম্পন্ন হলো। বিয়েতে যে শাড়িটা আমাকে দেয়া হলো তা খুব দামি নয়। কিন্তু আমার কাছে সেটিই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি শাড়ি। কালচে খয়েরি রঙ। শাড়িটা দেখলে মনে হয় কোথাও ছায়া ছায়া আবার কোথাও উজ্জ্বল। এ শাড়িটাই আমার জীবনের প্রথম নিজের শাড়ি। প্রথম দেখেই শাড়িটা আমার এতো ভালো লেগেছিল যে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রথম দেখাতেই যেমন তার প্রেমে পড়েছিলাম তেমনি শাড়িটারও প্রেমে পড়ে গেলাম।

পড়াশোনার জন্য আমি আর আমার স্বামী দুজনেই রাজশাহীতে বাসা ভাড়া করে থাকি। যখন বাড়ি যেতাম তখন শাড়িটি সঙ্গে নিয়ে যেতাম আবার আসার সময় নিয়ে আসতাম। এক কথায় আমি যেখানে থাকতাম সেখানে আমার শাড়িটিও থাকতো, কখনো হাতছাড়া করতাম না। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে শুধু ওই শাড়িটাই পরতে চাইতাম। তখন আমার স্বামী মোস্তাক বলতো এক শাড়িতেই যখন তোমার চলছে তখন শাড়ি কেনার টাকা দিয়ে একটি বাড়ি বানানো যাবে, না–কি বলো?

শুনে আমার কোনো ভাবান্তর হতো না। বিয়ের শাড়ি সবাই যত্ন করে তুলে রেখে দেয়। কিন্তু আমার শুধু ওটাই পরতে ইচ্ছা করে। এই শাড়ি পরে আমি বিয়ের কবুল পড়েছি। বাসর রাতের প্রিয় মুহূর্তের সঙ্গী এবং অনেক স্নিগ্ধ–মধুর স্মৃতির সাক্ষী এই শাড়ি। এ জন্য শাড়িটাকে এতো পছন্দ করি। ভালোলাগার অবশ্য আরো একটি কারণ অছে যা সবাইকে বলা যাবে না।

একবার বাড়ি যাবার সময় যথারীতি আমার শাড়িটি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ওই বছর আমার শাশুড়ি আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন এক খালাশাশুড়ির বাড়িতে। সেখানে কি করে যেন জানাজানি হয়ে গেছে যে, আমি আচার খুব পছন্দ করি। তাই খালাম্মা আদর করে আমাকে আচার খাওয়ালেন। তারপর একটি বাক্সে করে আচার বেধে দিলেন। সেই আচার আমরা বাড়িতে নিয়ে এলাম। যথারীতি আমাদের রাজশাহী ফিরে আসার সময় হলো। আসার দিন খুব তাড়াহুড়ো করে তৈরি হচ্ছিলাম এবং আমার শাশুড়ি আমাদের ছোট সংসারের জন্য চাল–ডাল এসব গুছিয়ে দিচ্ছিলেন ব্যাগে। একবার শুনলাম কে যেন আচারের কথা বললো। তারপর আর সেদিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। এরপর আমরা ফিরে এলাম রাজশাহীতে। *তিতুমীর* ট্রেনে রাত সাড়ে বারোটায় এসে গন্তব্যে পৌছালাম। কোনো রকমে ঘর পরিষ্কার করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর ইউনিভার্সিটির ক্লাস, রান্না–বান্না এসব নিয়ে বেশ ব্যস্ত দুই দিন সময় কাটলো। এর মধ্যে আমাদের চাল–ডালের ব্যাগ থেকে সব কিছু নামানো হয়েছে। কিন্তু কাপড়ের ব্যাগটি খোলাই হয়নি।

আরো দুই দিন পর রাতে আমাদের পাশের রুমে শুনতে পেলাম কে যেন আচার সম্পর্কে কি যেন বলছে। তখন আমার হঠাৎ করে মনে হলো শাশুড়ি তো মনে হয় ব্যাগে আচার দিয়েছিলেন। আচার তো পাওয়া যায়নি! কাপড়ের ব্যাগ খুলে দেখা গেল উপরেই সেটি রয়েছে। তবে সর্বনাশটা ঘটে গেছে আগেই। দেখা গেল আচারের তেল চুইয়ে সব কাপড়ে পড়েছে। রাজশাহী সিল্ক শাড়িটা উপরেই ছিল, সেটিতে আচারের তেল লেগে একাকার অবস্থা। তাড়াতাড়ি সেটি শ্যাম্পু দিয়ে ভিজিয়ে রাখলাম। তিন চারটা কাপড় তোলার পর দেখা গেল আর কোনো কাপড়ে লাগেনি। রাজশাহী সিল্কটা সেই রাতেই শ্যাম্পুতে ধুয়ে দুজনে মিলে ইস্ত্রি করলাম। একটু দাগও নেই। পরদিন মনের সন্দেহ দূর করতে আমার সেই শাড়িটা বের করলাম। শাড়িতে চোখ পড়তেই একটি ছোট আর্তনাদ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আমার অজান্তেই। দেখি গোটা শাড়িটাতেই ভাজে ভাজে তেলের দাগ বসে গেছে। মনে হচ্ছিল হাত–পা ছুড়ে কাদি। আচারের দিকে চোখ পড়তেই সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এলাম ডাস্টবিনে। ডেটারজেন্ট দিয়ে ধুলে যদি শাড়িটা আমার নষ্ট হয়ে যায় ভেবে এই শাড়িটাও শ্যাম্পু দিয়ে ভিজিয়ে পরিষ্কার করলাম। ভেজা অবস্থায় বোঝা যায়নি। কিন্তু শুকানোর পর দেখা গেল আবছা আবছা দাগ রয়েই গেছে। লন্ড্রতে দিয়ে কাপড় ধোওয়ানোর কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। এক বান্ধবীর কাছে পরামর্শ চাইলাম কি করা যায়? বললাম, লন্ড্রতে দিই।

বান্ধবী বললো, লন্ড্রতে দিলে নাকি শাড়ির বারোটা বাজিয়ে দেবে। তাই তা থেকে বিরত থাকলাম।
হঠাৎ বান্ধবী বললো, পেয়েছি।
আমার মনটা তখন খুশিতে ভরে উঠলো।
সে বললো, শাড়িটার দাগ এমনভাবে লেগেছে যে, সহজে কেউ ধরতে পারবে না। ব্যাপারটা প্রমাণিত করার জন্য কয়েকজনকে বললো, দেখো তো শাড়িটাতে কোনো কিছুর দাগ লেগেছে কি না? কেউ ধরতে পারলো না। সম্ভবত শাড়িটির আলো–ছায়া রঙ বৈশিষ্টের জন্য। বান্ধবী পরামর্শ দিল এভাবেই ইস্ত্রি করে ফেলার জন্য। আমি তাই করলাম। এখন অবশ্য কেউ ভালোভাবে পরখ না করলে বুঝতে পারবে না যে, এই শাড়িতে আচারের বিশাল বড় বড় দাগ রয়েছে। শাড়িটি তারপর যখন পরেছি তখন মনে একটুও স্বস্তি কিংবা প্রফুল্লতা আনতে পারিনি শুধুই মনে হয়েছে অন্যে হয়তো বুঝতে পারছে যে, আমি দাগওয়ালা শাড়ি পরেছি।
তারপর থেকে শাড়িটা আর পরা হয়নি। খুব যত্ন করে তুলে রেখেছি। এখন শাড়িটা যখন বের করি তখন ভালোলাগার পরিবর্তে বিষাদে মনটা ভরে যায়।

তিলকপুর, জয়পুরহাট থেকে

বৃষ্টিতে

– এস.এম পিয়ারুল ইসলাম

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। ক্লাস নাইনে পড়তাম। সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা ছিল। তবুও আমি দশটার দিকে স্কুলে গেলাম। স্কুলে যাবার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বেশি ছাত্রছাত্রী আসেনি। স্যাররা নাম প্রেজেন্ট করে সবার ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি গেটের কাছে চলে এলাম। দেখলাম বৃষ্টি একটু থেমেছে। ভাবলাম, তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যাই। আমাদের স্কুল বিকাল চারটার দিকে ছুটি হতো। আমি আনন্দে হাটতে শুরু করলাম। আমাদের স্কুল থেকে বাসা বেশি দূরে নয়। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি আরম্ভ হলো।
আমি দৌড়ে এক বাসার গেটের কাছে দাড়ালাম। তখন জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। গেটের ছাদ ছোট থাকার কারণে আমার জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছিল। হাতের বইগুলোও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে এক বুদ্ধি বের করলাম। ভাবলাম, এই বাসাতে বইগুলো রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গেলেই তো পারি। তাছাড়া এই বাসা তো আমাদের এলাকায়। তাই এ বাসার ভাবীকেও চিনি। আমি আস্তে করে কলিংবেলে চাপ দিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ভাবী ভিজতে ভিজতে দরজা খুললেন। সবুজ রঙ–এর একখানা শাড়ি পড়ে আছেন।
আমাকে দেখে বললেন, আরে, ভিজে যাচ্ছো তো। ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।
বললাম, ভাবী, বইগুলো রাখেন। আমি দৌড়ে বাসায় চলে যাই।
কিন্তু ভাবী নাছোড়বান্দা। আমাকে এক রকম টেনে বাসার ভেতর নিয়ে গেলেন। বারান্দায় উঠে বইগুলো রেখে চুল ঝাড়তে লাগলাম।

ভাবী বললেন, বুঝলে, বাসায় কেউ নেই। আমি বৃষ্টিতে ভিজে গোসল করছি আর আম কুড়াচ্ছি।
দেখলাম ভাবীদের বাসার উঠানে বড় একটা আম গাছ। ভাবীদের বাসার চারপাশ দিয়ে প্রাচীর দেয়া। বেশ কিছু আম ইতিমধ্যে ভাবী জমা করে রেখেছেন। ভাবীর দিকে তাকালাম। ভাবী একখানা সবুজ রঙ–এর শাড়ি পরে আছেন। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়িটা যেন বুকের ওপর লেপটে আছে। তার মাঝখান থেকে যেন উকি দিচ্ছে দুটি উচু স্তন। আমি লজ্জায় মুখ নামালাম।
ভাবী বললেন, এসো গোসল করি। বলে আমাকে বারান্দা থেকে নামালেন। আমি এবং ভাবী বৃষ্টিতে গোসল করতে লাগলাম আর কিছু আম কুড়ালাম। ভাবী মাঝে মধ্যে আমাকে ধরে কাছে টানলেন। বেশ কয়েকবার ভাবীর শাড়ির আচল কাধ থেকে খুলে পড়লো। ভাবীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি আম কুড়ানোর ছলে সরে গেলাম।
এক সময় ভাবী বললেন, নাও, আমরা ছোয়াছুয়ি খেলি।
বললাম, ঠিক আছে।
ভাবী প্রথমে আমাকে ছুলেন। আমি এদিক–ওদিক দৌড়েও বাচতে পারলাম না। তারপর ভাবীকে ছোয়ার পালা আমার। ভাবীও বৃষ্টির ভেতর এদিক–ওদিক দৌড়াতে লাগলেন। আমি ভাবীকে ছোয়া দিতে দৌড়ালাম। দ্রুত বেগে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবী হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি টাল সামলাতে না পেরে ভাবীর গায়ের ওপর পড়লাম। দুইজনে মিলে ঘাসের ওপর একদম চিৎপটাং। ভাবী নিচে আর আমি ভাবীর উপরে। দেখলাম ভাবীর বুকটা ওঠানাম করছে। বুকে আচল নেই।
বললাম, ভাবী, সরি, লেগেছে কোথাও?
লেগেছে। বলে ভাবী বুকটাকে ইশারা করলেন।
খুব লজ্জা লাগলো।
ভাবী বললেন, খুব ব্যথা পেয়েছি। বলে এক গড়ান দিয়ে আমাকে পেটের ওপর বসিয়ে দিলেন। আমার কচি হাত দুটো তার হাত দিয়ে ধরে স্তন দুটিতে ঠেকালেন। বললেন, ব্যথা পেয়েছি, মালিশ করে দাও।
আমার লজ্জায় কান ঝালাপালা।
তিনিই আমার হাত দুটি তার বুকে ঘষতে লাগলেন। দেখলাম তার বুক খুব গরম হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির পানি ভাবীর চোখ, মুখ, চুলে পড়ছিল। বৃষ্টির মাঝে দেখলাম ভাবীকে অন্য রকম লাগছে। ভাবীর সুন্দর বুকে আমার হাত নাড়াচাড়া করতেই ভাবী আমাকে জোরে তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। স্তন দুটি তখন ব্লাউজের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে কয়েকবার গড়ান দিলেন। আমি তো অবাক। তবে কেমন যেন এক ধরনের পুলক অনুভব করলাম।
তারপর তিনি উঠে গোসলখানায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর গোসলখানা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন বারান্দা থেকে শাড়িটা এনে দিতে।
বারান্দা থেকে শাড়ি পেটিকোটসহ আরো কিছু পোশাক নিয়ে গেলাম। গোসলখানার বাইরে থেকে বললাম, নিন।
তিনি বললেন, ভেতরে এসো।

ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকে আমি তো অবাক। একদম হার্টফেল হওয়ার মতো অবস্থা। ভাবীর গায়ে কোথাও শাড়ি বা কিছু নেই। একেবারে...। আমি শাদা চকচকে সব জিনিসগুলো দেখে অবাক। একেবারে যেন উদ্যত। আমি সরে আসতে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে ফেললেন। শক্তি দিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। আস্তে করে গোসলখানার মেঝেতে শুইয়ে দিলেন। তারপর একটানে আমার জামা–প্যান্ট খুলে দিলেন। আমি একেবারে আবরণহীন হয়ে গেলাম।

তারপর আমার এক সময় কি হলো কিছুই মনে নেই। একেবারে পাগল হয়ে গেলাম। ভাবীর মুখ থেকে অস্ফুট সব গোঙানি আসতে লাগলো।

এক সময় চরম আনন্দের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিচরণ করে ফিরে এলাম। ভাবী শান্ত হলেন। দুইজনে মিলে গোসল করলাম। আমার জামা–কাপড় তিনি ধুয়ে দিলেন। তারপর আমাকে একখানা লুঙ্গি ও টি–শার্ট দিলেন। আমরা গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি জামা–কাপড়গুলো মেলে দিলেন। আমরা ঘরে বসে কফি খেলাম।

এদিকে বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি যেতে চাইলাম। কিন্তু তিনি জোর করে আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালেন। তারপর বিভিন্ন গল্প করলাম। এর মাঝে বেশ কয়েকবার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার মুখে জানতে পারলাম তার স্বামী বিদেশে থাকেন। বিয়ের কিছুদিন পর বিদেশ গেছেন। বিকাল চারটার দিকে বইপত্র ও স্কুল ড্রেস পরে সোজা বাড়িতে চলে এলাম। বাসায় কাউকে কিছু জানালাম না।

সেদিন রাত থেকে প্রচণ্ড জ্বর ও সর্দি শুরু হলো। একেবারে বিছানায় পড়ে গেলাম। আর প্রত্যেকদিন রাতে স্বপ্ন দেখতাম। ভাবী সেই সবুজ শাড়ি পরে বৃষ্টিতে গোসল করছেন। এক মাস পর অসুখ সারলেও এখনো সেই সবুজ শাড়ির স্বপ্ন দেখি। তবে আর কোনোদিন ওই বাড়ির দিকে পা বাড়াইনি।

রাজশাহী থেকে

বন্যায়

– এলি খান

বয়স যখন পাচ বছর তখন আমার বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল–কলেজ পার করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পিকনিকে বান্ধবীদের দেখেছি ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরতে। কি গর্ব নিয়ে বান্ধবীরা বলতো, বাবা কিনে দিয়েছে। কেউ আবার বাবার সঙ্গে গিয়ে নিজেই পছন্দ করে কিনেছে। বাবার দেয়া শাড়ি পরার সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি। ন্যাপথলিন দিয়ে রেখে দিতে পারিনি কোনো শাড়ি যার ভাজে ভাজে শুধুই বাবার স্মৃতি। ধীরে ধীরে সময় এলো বিয়ের পিড়িতে বসার। সব ভাইবোনের ব্যস্ততা, ছোটাছুটি। বিয়ের বেনারসি কিনতে কয়েক বোন মিলে মিরপুর চলে গেলাম। যেটা দেখছি সেটাই পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। সবই কিনতে মন চায়। শেষ পর্যন্ত দুটো শাড়ি কিনলাম যাতে অন্যদের চেয়ে আলাদা হয় সে জন্য লাল বা মেরুন না কিনে নিলাম অফ হোয়াইট

শাড়িতে সবুজ পাড় এবং সোনালি শাড়িতে লাল পাড়। অনেক শখের আর সারা জীবনের স্বপ্নের শাড়ি।

১৯৯৮ সালের বন্যা আমার সেই স্বপ্নের শাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু বিবর্ণ করে দিয়ে গেছে। আমরা তখন ঢাকার বাসাবোতে ছিলাম। বন্যার হাটু পানিতে সব শাড়িই ডুবেছে। নষ্ট হয়েছে কেবল মায়ের দেয়া বেনারসি শাড়ি দুটো। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ঠিক এ শাড়িই আমি কিনে দেবো। এখনো হয়নি। আজ আমার অনেক শাড়ি। কিন্তু সেই বেনারসির মতো একটিও নয়।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

নাইট কোচে

– শিমূল

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার সুবাদে নাইট কোচে ঢাকা রওনা হয়েছি নগরীর সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে। পাশের সিটটি ফাকা দেখে মনে মনে খুশি হয়েছিলাম, যাক, গোটা পথ শুয়ে শুয়ে যাওয়া যাবে। দ্রুত গতিতে বাস ছুটে চললো শহরের বুক চিরে ঢাকার পথে। মেডিকাল কলেজের সামনে বাস হঠাৎ ক্যাচ ক্যাচ করে ব্রেক চাপলো। ভাবলাম কোনো দুর্ঘটনা হবে। এরপর বাস আবার তার নিজ গতিতে চলতে শুরু করলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম বাস হঠাৎ করে থামার কারণ। হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, এক্সকিউজ মি জানালার সাইডের সিটটি আমার।

বিরক্তির সীমা রইলো না। ডাবল সিট নিয়ে যাওয়া হলো না। আমার মতো আমি চুপচাপ বসে রইলাম যেন তাকে দেখিনি।

একটু পরে সেই মহিলা আবার এক্সকিউজ মি বলে প্রথমে তার পরিচয় দিলেন এবং তারপর আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

পরিচয় দিলাম।

তিনি বলেই ফেললেন, ভালোই হলো, আমি মেডিকালের আর আপনি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। ছাত্র মানুষ পাশে পেয়ে ভালোই হলো। না হলে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ভালোভাবে জার্নি করা কঠিন।

কথাগুলো তিনি অকপটেই বলে চললেন। হায় আল্লাহ! মনে হলো বাস থেকে নেমে যাই। ততোক্ষণে বাস নওয়াপাড়ার কাছাকাছি চলে এসেছে।

এবার তিনি আবার ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা, দেখুন তো শাড়িটি আমাকে কেমন মানিয়েছে? জার্নি করার সময় আমি সব সময় শাড়ি পরি। কারণ শাড়ি পরে জার্নি বেশ আরামদায়ক হয়।

কিছুক্ষণ এভাবে চলতেই আমার ঘুম চলে আসে। বাস শো শো গতিতে ছুটে চলছে হাইওয়ে দিয়ে। বাসের ভেতরে সমস্ত লাইট বন্ধ। সবাই আলো আধারিতে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একটু পরেই আমার মুখমণ্ডলে কোবরা পারফিউমের সুবাস মাখা একটি পর্দা আবিষ্কার করলাম। চোখ খুলে দেখলাম,

মহিলার শাড়ির আচল আমার মুখমণ্ডলে দোলা দিচ্ছে। মহিলাও চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেন। আস্তে করে শাড়িটি সরিয়ে দিয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলাম। একটু পর আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হতে লাগলাম। এরপর সামান্য ঘুমিয়েছি মাত্র। আমার ডান কাধে মাথা রেখে মহিলা ঘুমাচ্ছেন এবং তার সেই শাড়ি আমার সমস্ত শরীর আবৃত করে সুবাস ছড়াচ্ছে। এবার নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না যাত্রাপথে। নিঝুম রাতে এমন সুন্দর শাড়ি পরা একজন সমবয়সী নারীর শাড়ি স্পর্শ এবং আমার কাধে তার মাথা চিন্তা করতেই শরীরে বিদ্যুতের ঝলকানি অনুভব করলাম। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আস্তে করে আমার ডান হাতখানি তার কাধের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিলাম তার শরীরের ওপর।

এবারে অনুভব করলাম যে, আমার হাতকে আস্তে করে টেনে তিনি নামিয়ে দিলেন আসল স্থানে। সম্মতি বুঝতে পেরে আমার বাম হাতখানিও আস্তে করে চুকিয়ে দিলাম কোমরের প্যাচ ঘেষে নির্দিষ্ট স্থানে। এবারে সে তার নরম তুলতুলে মসৃণ গাল আমার ঠোটের কাছে ধরার চেষ্টা করলো। এ কাজটি সে এমনভাবে করলো যে সে কিছুই টের পায়নি। বিধাতা কি কারণে নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম।

কিন্তু সব সুখই ক্ষণিকের। প্রায় দেড়শ কিলোমিটার এভাবেই চললো। বাস আরিচা পৌছে গেল। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়লো। ততোক্ষণে আমরা দুজন বেশ ক্লান্ত।

রূপসা, খুলনা থেকে

বিধে থাকা কাটা

আমি রিয়া। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশী সবাই লক্ষ্মী মেয়ে হিসেবেই আমাকে জানে। ছোট থেকেই সবার ভীষণ আদরে বড় হয়েছি।

প্রথম কবে শাড়ি পরেছিলাম জানি না। তবে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালে নববর্ষ, জন্মদিন অথবা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বান্ধবীদের সঙ্গে শখ করে শাড়ি পরেছি, ছবি তুলেছি। সেই দিনগুলো ছিল ভীষণ মজার। আমরা পাচ বান্ধবী *ফাইভ স্টার* হিসেবে পরিচিত ছিলাম। ফাইভ স্টারের একজন মিথুনের বিয়েতে সবাই শাড়ি পরেছিলাম। নিজের শাড়ি নয়। বীথির মায়ের শাড়ি। লাল শাড়িতে বৌ সেজে মিথুনকে অপূর্ব লাগছিল। বিয়ের শাড়ি নামের বিষয়টি তখন থেকেই মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

দাদির বিয়ের শাড়িটি ছিল লালপেড়ে গরদ শাড়ি। নানিরটা ছিল হালকা গোলাপি আর মায়েরটা হলো পেচানো জরির কাজ। সবাইকে দেখতাম বিয়ের শাড়িটা ভীষণ যত্ন করে রেখেছেন। ভারতে রাজিব গান্ধীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তার বিয়েতে দাদি ইন্দিরা গান্ধীর শাড়ি পরেছিলেন এ বিষয়টা আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। কল্পনার মেঘে ভেসে ভেসে আমিও স্বপ্ন দেখতাম দারুণ সুন্দর একটা বিয়ের শাড়ির।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতিতে অনার্স করার সময় পরিচয় হলো রোহানের সঙ্গে। সমাজ বিজ্ঞান ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র রোহান কথা–বার্তায়, চলাফেরায় ভীষণ স্মার্ট। পরিচয় থেকে ভালোলাগা তারপর প্রেম, বিয়ে। মনে পড়ে, শাড়ি পরে রোহানের সঙ্গে প্যারিস রোডে হেটেছি। *সাবাস বাংলাদেশ* চত্বরে বসে গল্প করেছি।

বিয়ের ব্যাপারে দুই পরিবারের তেমন আপত্তি না থাকলেও রোহানের দুই ভাই–ভাবী ভিটো দিয়েছিল। সবার বড় ছিলাম বলে বিয়েতে উৎসাহ আর আনন্দের সীমা ছিল না। বিয়ের অনুষ্ঠান ত্রুটিমুক্ত করতে সবার ছিল প্রাণান্তকর চেষ্টা। শখ এবং সাধ্যের সমন্বয় করা হয়েছিল।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে স্থানীয় রেওয়াজ অনুযায়ী পেয়েছিলাম পচিশটি শাড়ি। সবগুলো শাড়িই ছিল বেশ সুন্দর। তারপরও বাবা–মা বাজারে নিয়ে গিয়ে আমার পছন্দের কয়েকটি শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। ছোট বোন দিয়া প্রশ্ন করতো, আপু তুই এতো শাড়ি কি করবি?

এতো শাড়ির মাঝেও মনে হতো আমার বিয়ের শাড়িটা যেন খুব সুন্দর হয়। এ জন্য কাতান শাড়ি কখনো পরিনি। বিয়েতে প্রথম কাতান পরবো বলে বান্ধবীরা প্রায় খেপাতো।

স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে ছিল বিয়ের আয়োজন। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে রোহান বর সেজে এলো। বিয়ে পড়ানোর সময় বরপক্ষের শাড়ির খোজ পড়লো।

কিন্তু একি! বিয়ের শাড়ি দেখে সবার *আক্কেল গুড়ুম* হয়ে গেল। সেজখালা চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। বান্ধবীরা প্রতিবাদ করতে চাইলো। কারণ তারা জানতো আমার শখের বিয়ের শাড়ির কথা। আমার মনের অবস্থার কথা, না–ই বা বললাম।

শাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল হোক, বিয়ে ভেঙে যাক, রোহানের ভাই–ভাবীরা তাই চেয়েছিল। তাই তো তারা পেরেছিল বিয়ের দিন অমন বিদঘুটে শাড়ি আনতে। কিন্তু বাঙালির চিরদিনের রেওয়াজ অনুযায়ী সেই শাড়ি পরেই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। খুব ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম। যেখানে নায়কের বাবা বিয়েতে নায়িকার পছন্দের শাড়ি কেনার জন্য নায়ককে বলেছিল। কিন্তু বাবাহীন রোহান ভাইদের টাকায় লেখাপড়া করতো বলে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ভেবেছিল বিয়েটাই প্রধান, শাড়ি নয়। তাছাড়া এই লাজুক রিয়া বিয়ের শাড়ি নিয়ে স্বপ্নের কথা তাকে কখনো বলেনি। জানলে হয়তো একটা কিছু করা যেতো। বিয়ের পর রোহান বলেছিল, তোমাকে সুন্দর একটা বেনারসি কাতান শাড়ি কিনে দেবো।

কিন্তু সংসারের বিভিন্ন ঝামেলায় সেও তো কথা রাখেনি। আসলে কেউ কথা রাখে না।

আমার গল্পের এখানেই শেষ। ব্যাচেলর ভাইয়েরা আশা করি আপনারা বিয়ের সময় প্রিয়জনের পছন্দের শাড়িটির কথা জেনে নেবেন।

এখনো বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে হয়। বিয়ের শাড়ি দেখে বুকের ভেতরে বিধে থাকা কাটাটা রক্ত ঝরায়। কল্পনায় ভেসে উঠে সুন্দর একটা শাড়ি!

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী থেকে

ইতিকথা

– আলতাফ হোসেন লাভলু

শাড়ি শব্দের উৎস হচ্ছে শাটী শব্দ। *শাটী* সংস্কৃত মানে শাড়ি শাটী : স্ত্রীং–সৎ, পরিধেয় বস্ত্র, শাড়ি। আবহমান বাংলায় শাড়ি কবে থেকে ও প্রচলন তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে পুরনো লেখমালা, মূর্তি বিগ্রহ, স্থাপত্য, পোড়ামাটি শিল্প শুরু ও সাহিত্য উপাদান থেকে জানা যায়, আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৬২ খৃস্টাব্দে শাড়ির উৎস ও সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতেও শাড়ি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। অনেকের মতে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকের যে কোনো সময়ই হতে পারে। কবিতায় *শাড়ি, অঞ্চল কাঁচুলি* জাতীয় শব্দাবলী চোদ্দ শতকের শাড়ির প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর আগে চর্যাগীতিতে যা রচিত নবম বারো শতকে। (এক সময় মেয়েদের বসনের ওপর জড়ানো অংশের নাম ছিল *আধনা* (আধাখানা) *সেওটা* ও *আধনা*–ই আজকের *আচল* সংস্কৃতে *অঞ্চল)*। প্রাচীন কথা কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান সর্বত্র আমরা শাড়িই পাই, অস্তিত্ব খুজে শাড়ি শব্দের, ভাষাতত্ত্বে প্রমাণ পাই তার বিবর্তনের।

শাড়ি ধারণাটিই সৃষ্টি সেলাইবিহীন বস্ত্র খণ্ড থেকে। এই অখণ্ড বস্ত্র পুরুষের বেলায় অভিহিত হয়, ধুতি এবং মেয়েদের বেলায় শাড়ি নামে। উপমহাদেশের তখন সর্বত্র সেলাই ছাড়া কাপড় পরা ছিল রীতি। প্রাচীন ভারতের মেয়েদের সেই আদি বসনই আজকে শাড়ি। শাড়ি মানে গাত্রাচ্ছাদন আভরণ। শাড়ির জন্ম এ মাটির বুকেই। শাড়ির বর্ণালি বিকাশ ও বর্ণাঢ্য প্রকাশও এ আলো হাওয়াতেই। দশ বারো হাতের শাড়ির প্রচলন হওয়ার পরেও একক রূপে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

সিয়ন শিল্প আবিষ্কারের পর হয় ব্লাউজ। কিন্তু তারও আগে সেমিজ। সেমিজের দ্বিখণ্ডিত রূপই ব্লাউজ ও পেটিকোট। এরও আগে নারীদের অধোবাস দীর্ঘ হয়ে উত্তরবাসে রূপ নেয় এবং সঙ্গে বক্ষাবরণের আলাদা টুকরোটিও (স্তনপট্ট) থেকে যায়। এই স্তনপট্টই পরবর্তী কালের কাচুলি যার অতি আধুনিক রূপ বক্ষ–বন্ধনী (ব্রা)। (কাচুলি সেলাই ছাড়া খণ্ড কাপড় সামনের দিকটায় টেনে পেছনে বাধা)। প্রাচীন বাংলায় মধ্যবিত্ত ঘরের বৌদের কাছে ঘোমটা ছিল কুল মর্যাদার লক্ষণ।

শাড়ির রূপ পাল্টাচ্ছে যুগে যুগে। কালিদাসের *শকুন্তলার শাড়ি* আর বিদ্যাসুন্দরের *বিদ্যার শাড়ি* এক নয়। এক সময় রবীন্দ্রনাথের *চারুলতা* ও নজিবর রহমানের *আনোয়ার শাড়ির* এ ভিন্নতা শুধু শাড়ির বৈচিত্র নয়, শাড়ি পরার ধরনেও। শাড়ি পরে প্রচলিত জনপ্রিয় কয়েকটি ধরন বা পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো :

এক. শাড়ি আকড়ে ধরে কোমর, কোমর জড়িয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে ওঠে উপরে, লতিয়ে থাকে বুকে, কণ্ঠ বেষ্টন করে কাধ ছুয়ে ছড়িয়ে পড়ে পিঠে। এ পদ্ধতিতে পৌছাতে হয়েছে পরিবর্তনের অনেক চৌকাঠ ডিঙিয়ে।

দুই. *এক প্যাচ* : সেমিজ বা পেটিকোটের ওপর শাড়িটিকে লাগিয়ে প্রথমে ডানে, পরে বায়ে লম্বা ভাজ দিয়ে জড়িয়ে টেনে এনে ডান হাতের নিচ দিয়ে আলগা করে বা কাধে আচলের সামান্য অংশ রাখার যে ধরন তার নাম এক প্যাচ। আধুনিক ধরন বলে বিবেচিত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

পর্যন্ত। এ ধরন চালু ছিল সুদীর্ঘকাল, এখনো গ্রামে প্রবীণ মহিলারা চলটা অব্যাহত রেখেছে। এক প্যাচের কায়দাকে আটপৌরে বলে এর সুবিধা প্রচুর। একদিন এ ধরনও পাল্টে যায়।

দুই প্যাচ : দুইবার জড়িয়ে অর্থাৎ দুই প্যাচ দিয়ে পরার ধরনটি বলতে গেলে উঠেই যায় শহর ও নগর অঞ্চলে।

তিন. *কুচি পদ্ধতি :* কোমর পেচিয়ে সামনের অংশে কুচি দিয়ে পেটের দিকে লতিয়ে বুক ঘিরে ছন্দময় ভঙ্গিতে উপরে উঠে বা কাধ ছুয়ে আচল আছড়ে পড়ে পিঠে। আচল অবগুণ্ঠনের কাজও করে। একালে অবগুণ্ঠন মানে আর মুড়ি–ঘোমটা নয়, আব্রুর মাধ্যমে সৌন্দর্য অধিকতর পরিস্ফুটিত করার পন্থা। অবগুণ্ঠন মানে এখন মাথার তালুর কাছে আলতো করে আচল তুলে দেয়া, পাশে বড়জোর কান পর্যন্ত ছোয়া, চুলের বিন্যাস ব্যাহত না করে মাথায় এমনভাবে এর অবস্থান হয় যার জন্য যঙ্গে গড়া করবী বা বিনুনির ছাদ, কণ্ঠহার, কুন্তল কিছুই একেবারে ঢাকা পড়ে না।

বাঙালির নান্দনিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শাড়ি। ষোড়শ সপ্তদশ শতক ছিল তাতের শাড়ির স্বর্ণময় যুগ। এ সময় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মসলিন ও জামদানির অবিস্মরণীয় খ্যাতি সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে। এই খ্যাতি মণিমাণিক্য হীরা জহরৎকে কেন্দ্র করে নয়, তা ছিল *মসলিন* নামের এক অপরূপ শাড়ি নিয়ে। এই ভুবনমোহিনী শাড়ির অনিন্দ রূপের অন্তরালে কোনো আশ্চর্য জাদুকরের চেরাগ ছিল না, ছিল শিক্ষা বঞ্চিত অতি সাধারণ তাতীদের নিপুণ হাতের অসাধারণ কারুকাজ। ইরাকের বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র *মসুল* থেকে মসলিন শব্দ উদ্ভুত ও মসলিন শাড়ির নামকরণ। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র দিয়ে তৈরি হতো এ শাড়ি। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত মসলিন শাড়ি (দশ গজ × এক গজ) ওজন মাত্র সাত তোলা। সব মিলিয়ে মসলিন ও জামদানি পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে। এছাড়া স্থান জুড়ে শাড়ির নাম হয়, *ঢাকাই মসলিন, রাজশাহী সিল্ক, মিরপুর কাতান, পাবনার তাত, টাঙ্গাইলের জামদানি সিল্ক।* তা ছাড়া *সিল্ক, কাতান, ব্রাশ পৃন্ট জর্জেট, কটন* এসব শাড়ি।

বাংলার মেয়েদের আবহমান কালের শাড়ি অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। যুগে যুগে বাংলার কবি সাহিত্যিক বাংলার নারীর সৌন্দর্য বন্দনায় আর প্রেমের প্রকাশে শাড়ির বর্ণনায় মুখর হয়েছেন। (যে লাবণ্য বিকশিত হয়েছে চর্যাপদ যুগের 'ময়ূরের পুচ্ছ খোপায় গোজা শবরীর রূপে', যে 'চপলা চমক' বিধৃত হয়েছে মধ্য যুগের নীল শাড়ি পরা কাঞ্চন বরণীর হাসির ঠমকে সেই রূপই ফুটে ওঠে এ যুগের 'হলুদ শাড়ি লেপটে থাকা রূপসী শরীরের পরে।) রাধা যখন কৃষ্ণ অভিসারে যান তখন তার পরনে ছিল রূপালী জরি কাজের মেঘবরণ শাড়ি। কবি রাজশেখর এ শাড়ির নাম দিয়েছেন *মেঘাম্বরী শাড়ি।* কখনো নীল শাড়িকে ভালোবাসার শাড়ি বলে চিহ্নিত করা। মেঘ রঙ শাড়ি যে বিরহের প্রতীক কালিদাসের *মেঘদূত*–এ তা জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলার প্রকৃতি নারী, নারীর প্রতিচ্ছবি শাড়ি। বাংলাদেশের কল্পনায় শাড়ি বাংলার নদী। এদেশের চরিত্র দান করে নদী, নারী, শাড়ি। শাড়ি বাঙালির নারীর সঙ্গে মিশে গেছে এক হয়ে, পরিণত হয়েছে অভিন্ন সত্তায়। নারীর দেহে শাড়ি শুধু নারীর দেহের আভরণ নয়, নারীর প্রতিমূর্তিও। শাড়ি শিল্প, শাড়ি সংস্কৃতি, শাড়ি ঐতিহ্য।

বৈশাখ আর বাংলা নববর্ষ মুখর হয় ঘি রঙ, লালপাড় শাড়িতে। বাসন্তী রঙ, লাল পাড় শাড়ি আনন্দ–আবাহন জানায় বসন্ত কালকে, মেঘ রঙ শাড়ি মেঘমেদুর বর্ষাকে। শাদা–লাল পাড়ের শাড়িতে ছবি কল্যাণী গৃহিণীর। ডুরে শাড়িতে স্নিগ্ধা পল্লিবালা, নকশি পাড়ের ঘোমটায় বধূর ছবি

আকা। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে হলুদ রঙ শাড়ি, বিয়েতে বেনারসি। বেনারসি বিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে, বধূবেশের সঙ্গে অনিবার্য হয়ে। শাদা শাড়ি শুচি স্নিগ্ধতার প্রতীক, পরিচয় পবিত্রতার। শাড়ির প্রতীক ভালোবাসার, প্রতিচ্ছবি নারীর, পথিকৃৎ সুরুচির। পুরনোকে বর্জন না করে, পরিবর্তনে-পরিশীলনে পরাঙ্মুখ না হয়ে প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয়ে শাড়ি টিকে আছে সময়ের সঙ্গে সমঝোতা করে।

ঢাকা থেকে

নববধূ

– মাহফুজা মান্নান

বিয়ের পর যখন নতুন ঈদ এলো তখন তো মজাটাই অন্য রকম। একদিকে নতুন মানুষ। নতুন শাড়ি উপহার পাওয়া এসবে মন থাকে চঞ্চল। উপহার পাওয়া শাড়ির মধ্যে আমার একটা শাড়ি ভীষণ ভালো লাগলো। যাই হোক। ঈদে স্বামীর সঙ্গে নতুন, সুন্দর শাড়ি পরে ঘুরতে বের হলাম। আমরা ঘুরতে বের হয়েছি রিকশায় করে। স্বামীর সঙ্গে গল্পে ভীষণ মজে আছি।

হঠাৎ দেখি আমি রিকশা থেকে পড়ে যাচ্ছি। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে স্বামীকে বললাম, আমাকে ধরতে। তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। ততোক্ষণে যা হওয়ার তাই হলো। আমার শাড়ির আচল রিকশার চাকার সঙ্গে পেচিয়ে গিয়েছে। রিকশাচালক রিকশা থামিয়ে দিয়েছে। তারপর রিকশাচালক এবং আমার স্বামী চাকা ঘুরিয়ে আমার শাড়ি বের করলো। কিন্তু শাড়ি দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া। শাড়ির আচল ছিড়ে কালি মেখে একাকার। এদিকে আমার স্বামীও ভীষণ বিরক্ত আমার এই অসাবধানতা দেখে। আমি নতুন বৌ। সে রকম কিছু বলতেও পারছে না আবার সহ্যও করতে পারছে না। আমার একদিকে যেমন শাড়ির জন্য মন খারাপ, অন্যদিকে তাকে দেখেও ভয় করছে। গেল সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে।

তাই আমার মতো যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে তাদের বলছি, স্বামীর সঙ্গে রিকশায় ওঠার সময় শাড়ির আচল ঠিক করে নেবেন। আমার মতো শাড়ি এবং আনন্দ দুটাই নষ্ট করবেন না।

ফুলবাড়ি, মধ্যপাড়া, বগুড়া থেকে

হাফপ্যান্ট রহস্য

– ছগির মাহমুদ

হঠাৎ করেই কনে দেখতে যাওয়া। স্বাভাবিক ঘরোয়া পোশাকে হবু বধূর প্রথম মুখ দর্শন। শাড়ি পরে চিরায়ত ললনার রূপ দেখানোর অবসর ছিল না তার।

বিয়ের আগে অভিসারের ইচ্ছায় একদিন উদ্যানে বেড়াতে গেলাম আমরা। আশা ছিল একটা হালকা-পাতলা, পিচ্ছিল গোছের বেয়াড়া শাড়ি পরে সে আসবে। এলোমেলো হাওয়ায় শাড়িটা ডানা মেলে দিতে চাইবে। আর সেই সুযোগে আমি তার শরীরের আনাচে-কানাচে দেখবো। সালোয়ার-

কামিজ পরিহিতা হবু স্ত্রীর সঙ্গে নিমেষেই কেটে গেল দুই আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু আমার অন্তরে লুকানো আশা আশাই রয়ে গেল।

তৃতীয় সাক্ষাতে দুইজন দুজনকে কবুল করলাম। পূর্ব নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শুধু কলেমা কবুল পড়েই দুজনের বিচ্ছেদ। তবে শারীরিকভাবে তাকে কাছে না পাওয়ার জন্য দুঃখ বা আফসোস হলো না। যা হলো সেটা তার পোশাকের জন্য। বলি তার গার্ডিয়ানরাই বা কেমন? বিয়ের দিনেও তাকে একটি শাড়ি পরানো গেল না!

পরবর্তী সাক্ষাৎ একটি বাণিজ্য মেলায়। ছোটভাইকে পাঠালাম। সে এলো। বোরখা পরা। অনাবৃত মুখ। বোরখার নিচে হয়তো ছিল কাঙ্ক্ষিত শাড়ি? ছিল না।

আমার একটি হাত আলগোছে তার নরম হাতের মধ্যে চলে গিয়েছিল। লক্ষ্য করলাম, মেলায় ইচ্ছাকৃত বেখেয়ালি পুরুষদের ঘর্ষণ এড়াতে তার কোমল বক্ষদেশ আমাকেই হানছে।

মেলার প্রতিটি কর্নার ঘুরলাম। কতো কি কেনা হলো। একটি দামি থৃ পিসও কিনে দিলাম তার পছন্দ মতো। শুধু শাড়ির স্টলগুলোর প্রতিই যতো অনাগ্রহ তার।

আমারও আগ্রহ হলো তার শাড়ি রহস্য অনুসন্ধানের। আপাতত তার বোরখাবৃত শরীরের মৃদু মৈথুনেই তৃপ্ত হলাম। আর অপেক্ষায় রইলাম নিকট ভবিষ্যতের বাসর রাতটির জন্য। নিশ্চয়ই সেদিন শাড়ির মোড়ক থেকেই তাকে খুলে দেখবো।

বৌ তুলে আনা হলো। কারুকার্য খচিত মোটা আর ভারী একটি শাড়ি পরিহিতা। কিন্তু গাড়ির ভেতরে এহেন অবস্থায় তার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। গাড়ির জানালার সব কটা কাচ নামিয়ে দিলাম। সম্ভব হলে দরজাও খুলে দিই আর কি।

অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ বৌকে তার চিরস্থায়ী ঠিকানায় প্রদর্শনীর দর্শকদের কাছে সোর্পদ করা হলো। আর তখনই ব্যাচেলর দুই বন্ধু কর্তৃক একটি গাড়িসহ ছিনতাই হলাম আমি। তাদের উদ্দেশ্য, সারা দুনিয়ায় আমার তাদের দলছুট হয়ে যাওয়ার কাহিনী রটানো, নববধূর উষ্ণ স্পর্শ লাভে বিলম্ব ঘটানো। মাঝ রাতে তাদের কবলমুক্ত হলাম। ততোক্ষণে এ বাড়িতে আগন্তুক নববধূও দর্শনার্থীদের রাহুমুক্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট নির্জন ঘরে তার অবস্থান। অতঃপর তরুণীটির ঘরে আমাকে কয়েদ করা হলো।

তরুণীটি কাত হয়ে শুয়ে আছে যেন এ বাড়ির বহু পুরনো এক সদস্য। একটা ওড়না জড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত আটোসাটো স্থানটিতে। আর যখন আমার চোখ ও দুই হাত তার শরীর সমীক্ষায় ব্রতী হলো তখন আবিষ্কৃত হলো যে তিনি হাফ প্যান্ট পরিহিতা!

এটাই নাকি তার ঘুমানোর ড্রেস!

হায় কপাল!

বাসরঘরে হাফপ্যান্ট পরা স্ত্রী!

গরম আর ঘামাচি থেকে বাচতে এটা নাকি তার পুরনো অভ্যেস।

যাহোক, আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলাম এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো উত্তম পরামর্শ দিলাম। সম্পূর্ণ বস্ত্রমুক্ত হয়ে শুতে যাওয়ার অনুমতি তাকে দেয়া হলো।

পরবর্তী কালে দুই চার দিন যে সে শাড়ি পরেনি তা নয়। তবে বিবাহিতার বিশেষ আবশ্যকীয় স্নান শেষে শাড়ি পরিহিতার ভেজা চুলে তোয়ালে জড়ানো দৃশ্য দেখার জন্য আমাকে অপেক্ষা আর

সংযমের দুরূহ পরীক্ষা দিতে হয়েছে দীর্ঘ দিন। হাতের কাছে ভরা কলস অথচ তৃষ্ণায় ছটফট করেছি সপ্তাহ ভর।

এরপর সে দিনে দিনে পুরনো হতে থাকলেও নতুন নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু তাদের অনেকেরই সৌভাগ্য হয়নি তার শরীর জড়িয়ে স্বামীর প্রশংসা পাওয়ার। দুই চারটা শিকেয় তুলে রাখা থাকলেও পরস্ত্রীর শরীরে আসক্ত হয়েছে অধিকাংশ সংখ্যক শাড়ি। কারণ মুক্তহস্তে শাড়ি বিতরণে সে হাতেমতাই আত্মার অধিকারিণী।

বোন–ভাবী, চাচি–খালাদের অকৃপণ শাড়ি প্রেজেন্ট করায় তার অকুণ্ঠ সুনাম। তবে স্ত্রীর এমন দরাজ মানসিকতা তার স্বামীর কাছে খুব একটা প্রশংসনীয় হয়ে ওঠেনি। কারণ স্বামী তো তখনো স্বীয় স্ত্রীর শাড়ি বিরাগের রহস্য আবিষ্কারে ব্রতী।

অবশেষে একদিন ধৈর্যচ্যুতি হলো আমার বিশেষ পছন্দের একটা শাড়ি কাজের বুয়ার শরীরে দেখে। দুই কথা শোনাতে ছাড়লাম না সেদিন। হাফপ্যান্ট পরে বাসরঘরে উপস্থিত হওয়ার খোটাও দিলাম। সে কিছু বললো না। উজ্জ্বল হাসির ঝিলিক মাখানো মুখে সারাটা দিন ছিল অন্ধকার মেঘের ঘনঘটা। ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পেলেও পাত্তা দিলাম না একদম।

রাতে বৃষ্টি নামলো। আজই প্রথম সে শাড়ি পরে বিছানায় এলো। চোখের জলে ভিজতে থাকলো শাড়িটা। সে শাড়ি ভীতির কারণটা বললো।

তার এক বড় বোনের আত্মহত্যার কথা জানতাম। কিন্তু জানতাম না আসলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। পাষণ্ড স্বামী তাকে শ্বাসরোধ করে মেরেছিল। আর হত্যার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল তারই পরনের শাড়িটি। তারপর শাড়ি দিয়েই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল তার লাশ।

দৃশ্যটি সে দেখেনি। কিন্তু প্রায়ই সে কল্পনায় সেই দৃশ্যটি দেখে। দুই একবার দুঃস্বপ্নে নিজেকে গলায় শাড়ি বেধে হত্যা বা আত্মহত্যা করতে দেখেছে। শাড়ি বিষয়ে এই নির্মম অভিজ্ঞতা তার ভেতরে এক ধরনের ভীতির জন্ম দিয়েছে।

ষষ্ঠীতলা পাড়া, যশোর থেকে

লেবাস বাংলাদেশি

– মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন বেলাল

ইরানি বৌকে শাড়ি পরানোর ইচ্ছা মনে জাগতেই দেশে চিঠি লিখলাম শাড়ি পাঠানোর জন্য। ডিএইচএল/ইএমএস–এর কল্যাণে অনেক শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট এসে গেল। সমস্যা দেখা দিল বৌকে শাড়ি পরানো নিয়ে। কারণ আমি কাউকে শাড়ি পরানো তো দূরের কথা, কাউকে শাড়ি পরতেই দেখিনি। তারপরও এক ঈদের দিনে অনেক চেষ্টা করে তাকে শাড়ি পরালাম। সেই শাড়ি পরে সে হাটতেই পারছিল না। কেননা আমি সঠিকভাবে শাড়ি পরাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।

যাই হোক। শাড়ি পরিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেলাম। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে এই পোশাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল এবং বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, এটা তুমি কি পোশাক পরেছো! সে মিষ্টি হেসে জবাব দিল, লেবাস বাংলাদেশি মানে বাংলাদেশের পোশাক।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

ঘ্রাণ

– ইমরান হোসেইন

প্রতিদিনই ভাত খেয়ে বেসিনে হাত–মুখ ধুয়ে মায়ের আচলে মুছে নিতাম। এটা আমার প্রায় অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়েছিল। আমার ভাইবোনেরা এটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করতো। কিন্তু মায়ের আচলে মুখ মুছতে গিয়ে আম্মার শাড়ির থেকে একটা অদ্ভুত মাদকতাময় গন্ধ পেতাম যে গন্ধের সঙ্গে এই পৃথিবীর কোনো কিছুরই তুলনা চলে না। আবার মাঝে মধ্যে আম্মার আচল ধরে নাড়া দিয়ে বলতাম, *চল, ঘোড়া চল।* আম্মা মাঝে মধ্যে কপট বিরক্তি প্রকাশ করতেন। কখনো মাঝে মধ্যে আমার ছেলেমানুষিতে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়তো।

ছোটবেলায় আম্মার শাড়ির আচলের কোণায় সব সময় ভাঙতি পয়সা গিট বাধা থাকতো। আমাদের সব ভাইবোনের আকর্ষণ ছিল ওই গিটের ভেতর। কতোবার ওই গিট খুলে পয়সা নিয়ে আইসক্রম, চকলেট খেয়েছি!

আম্মা সারাদিন হাড়ভাঙা সাংসারিক কাজের মধ্যেও আমাদের আট ভাইবোনকে তার শাড়ির আচলের তলায় কতো যত্নেই না বড় করেছেন। নিজের ভালো–মন্দের দিকে কখনোই তাকিয়ে দেখেননি। আজ দুই মাস হলো ব্যবসার কারণে আম্মার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। কিন্তু প্রতিদিনই আম্মার শাড়ির আচলের সেই ঘ্রাণ নেয়ার জন্য মনটা ছটফট করে।

ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম থেকে

সম্পর্ক

প্রথম যখন এখানকার অফিসে জয়েন করলাম তখন নিজেকে খুবই একা মনে হতো। বাড়ির জন্য মন কাদে, কাজ–কর্মে মন বসে না, কেবল সমুদ্রের মতো হু হু করে ওঠে মন। অফিসের সিনিয়র সুমিআপার আন্তরিক ব্যবহার ও সহানুভূতিতে এক সময় কাজকর্মে থিতু হলাম।

সুমিআপা চাকরিতে আমার চেয়ে পাচ ছয় বছরের সিনিয়র। সদা হাসিমুখী এই মানুষটি এখনো কুমারী। অফিসের একটা কোয়ার্টারে তিনি এবং নীলুআপা ফুল একোমোডেশন নিয়ে থাকেন। নীলুআপার শ্বশুরবাড়ি অফিসের দশ কিলোমিটার পরে। অধিকাংশ সময়ই তিনি কোয়ার্টারে থাকেন না। নামকাওয়াস্তে বরাদ্দ নেয়া আর কি। সুমিআপার অনুরোধে অফিস আমাকেও ওনাদের সঙ্গে বরাদ্দ দিল।

এদিকে সুমিআপার আচার–ব্যবহারে দিন দিন ওনার ভক্ত হয়ে গেলাম। আমার হোম সিকনেসটাও কমে এলো। আমার যে কোনো সমস্যার সমাধান একমাত্র সুমিআপা। আমি একটু মুখ মলিন করলেই কোথে কে তিনি দৌড়ে আসেন আর জড়িয়ে ধরেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করতো।

অফিসের অন্য কলিগরাও আপার বেশ অনুরক্ত বোঝা যায়। ওনার যে কোনো কথায় সবাই হ্যা হ্যা করে। অবশ্য সুন্দরী মেয়েদের শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব হয় না বলে জানি। বলে রাখা ভালো, আপা খুবই সুন্দর না হলেও বেশ সুন্দর বলা যায়। পরিবেশ, আবহাওয়া ও শরীরের রঙের সঙ্গে ম্যাচিং করে শাড়ি পরলে তাকে এতো স্মার্ট এবং সুন্দর লাগে যে, স্বয়ং ঐশ্বরিয়াও হার মানবে।

সুমিআপা বিয়ে করছেন না কেন জিজ্ঞাসা করলে কেবল মিটিমিটি হাসতেন, কিছু বলতেন না। অফিসের কেউ কেউ ফিশফিশ করতো। তিনি এগুলো কেয়ার করেন না।

হঠাৎ একদিন অফিস ঘোষণা করলো, আমাদের নির্বাহী পরিচালক পরিদর্শনে আসছেন। হুলস্থুল পড়ে গেল। মেয়েদের প্রতি নির্দেশ এলো, সবাইকে শাড়ি পরে স্মার্ট হয়ে আসতে হবে। অতিথিদের গেট থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে রিসিভ করার দায়িত্ব পড়লো আমারই ওপর।

মাথার ওপর আমার যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। প্রথমত. আমি শাড়ি পরতে জানি না। দ্বিতীয়ত. আমার কোনো শাড়িও নেই। অফিসের অন্যরা বার বার বললো, বুঝলে, শুরুটাই আসল, মর্নিং শোজ দি ডে।

সুমিআপাকে আমার এ মহা সমস্যার কথা বলতেই এক গাল হেসে দিলেন।

তুই কেমন মেয়েরে বাবা, শাড়ি পরতে জানিস না।

সুমিআপা আমাকে আদর করে তুই বলে ডাকেন। আমার ভালো লাগে।

আরে বাবা, তোর সুমিআপা যখন আছে আর ভাবিসনে। তোকে শাড়ি–টাড়ি কিনতে হবে না। আমার শাড়ি পরেই তুই অনুষ্ঠানে যাবি, তোকে এমন মেকআপ দেবো, কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না বলেই নাক টেনে দিলেন।

সময় যেন তাড়াতাড়ি চলে এলো। অতিথিদের আসার কেবল একদিন মাত্র বাকি। ভীষণ টেনশনে আছি। নীলুআপা ছুটি নিয়ে ঝামেলামুক্ত। রুমে আমি আর আপা।

অনুষ্ঠানের আগের দিন রাতে আপা বললেন, চল তোকে শাড়ি পরা শিখিয়ে দিই। আজকে ভালো মতো ট্রেনিং না দিলে শাড়ি পেচিয়ে পড়ে সবার মান–সম্মান ডোবাবি।

আলমারি থেকে ওনার হালকা নীল রঙের ফিনফিনে শাড়িটা বের করে দিলেন। সঙ্গে ম্যাচিং রঙের ব্রা, পেটিকোট ও ব্লাউজ।

রুমের দরজা জানালার পর্দা নামিয়ে দিয়ে চুলার ওপর ভাতের ডেকচি নামাতে তিনি রান্না ঘরে দৌড় দিলেন।

আমি সালোয়ার–কামিজের ওপর শাড়িটা একবার এদিক আবার ওদিক পেচিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখছি আর ঘামছি। ঠিকমতো সামনের কুচিটা মেলাতে পারছি না।

আমার দুরবস্থা দেখে আপা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন।

আপা প্রথমে আমার সালোয়ারের ফিতা খুলে নামিয়ে দিলেন। সুতির প্যান্টিটা পরাতে গিয়ে কয়েকবার যোনিতে হাত দিলেন। হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, এ রকম হালকা সুতির প্যান্টি পরলে তোর পাছার খাজটা শাড়ির ওপর সুন্দর করে ফুটে উঠবে। বলে তিনি চিমটি কাটলেন।

আমার গা শির শির করলো। লজ্জায় কিছু বললাম না।

কামিজ খুলে ব্রা পরাতে গিয়ে *ওয়াও* বলে অস্পষ্ট একটা চিৎকার যেন দিলেন।

তোর স্তন দুটি তো তিন কেজির বেশি হবে বলতে বলতে স্তনের বোটা ধরে হালকা টান দিলেন এবং ব্রা–টাও পরিয়ে দিলেন।

তোমারগুলোও কম হবে না আপা। আমি সাহস করে হেসে বললাম।

এ কথা বলার সঙ্গে ওনার মুখ থেকে হাসিটা দপ করে নিভে গেল। খানিক পরে হালকা হাসি টেনে আনলেন।

দেখবি নাকি?

অবশ্যই দেখবো। আমারগুলো দেখবে আর তোমারগুলো দেখাবে না, তাতো হবে না।

ঠিক আছে, আজ নয়। অন্যদিন ভালো করে দেখিস।

আমি নাছোড়বান্দা, দেখবোই। জোর করে তার কাপড়–চোপড় খুলতেই আমার মুখটা দুঃখে নীল হয়ে গেল। কারো এতো কষ্ট, এতো বেদনা যে লুকিয়ে থাকতে পারে তা কখনো জানতাম না।

আপা হঠাৎ ডুকরে কেদে উঠলেন। এ রকম কান্নার জন্যে একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো।

পরিস্থিতি বদলাতে তাড়াতাড়ি বললাম, আপা, আজকে শাড়ি পরা বাদ দাও। চলো আজকে এক খাটে শুয়ে পড়ি।

তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

বাতি নিভিয়ে দিলাম। আপার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আর তিনি আমাকে জড়িয়ে গল্প ধরলেন। বললেন, চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিকে বামপাশে একটু একটু ব্যথা করতো। তখন আমল দিইনি। একদিন সকাল বেলা উঠে বাম স্তনে বেশ ব্যথা লাগছিল। হাত দিয়ে দেখি একটা শক্ত দলা পাকিয়ে আছে।

অফিস ছুটি নিয়ে অনেক দূরের এক ক্লিনিকে দেখানোর পর ডাক্তার বললেন, ব্রেস্ট ক্যান্সার। স্তনটা সহসা কেটে ফেলতে হবে। তখন আমার বিয়ের পাকা কথাবার্তা চলছিল। আমি বেকে বসলাম। *আমার একজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে* বরপক্ষকে এমন একটা চিঠি দিয়ে দিলাম। তারা আর এগোয়নি।

এক নিঃশ্বাসে এতোটুকু বলে তিনি থামলেন।

তার অস্থির হাত তখন আমার পুরো শরীরে ঘুরছে। দুজনের শরীরে কোনো কাপড়–চোপড় নেই। আমার পুরো শরীর কেমন যেন করছে। আপা নরম ঠোট জোড়া আমার ঠোটে বসিয়ে দিলেন। আমাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুললেন। আমিও কটা প্রত্যুত্তর দিলাম।

আপার বেপরোয়া হাত, নখ ও ঠোটের কারুকাজে অবশ হয়ে গেলাম। কোনো বোধশক্তি কাজ করছিল না।

দুজনে এক সময় স্থির হয়ে এলাম।
তারপর তিনি তার অসমাপ্ত কাহিনীটা সমাপ্ত করলেন।
শেষ পর্যন্ত অফিস থেকে লোন নিলাম এবং কাউকে না বলে বড়ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে অপারেশন করালাম। নতুন ডাক্তারটা শ চেষ্টা করে খালি জায়গাটা ভরাট করতে পারলেন না, বরং বামপাশটা আরো শুকিয়ে গেল। কাউকে এখনো জানাইনি কিছু।
বলতো এ অবস্থায় কে আমাকে বিয়ে করবে? আপা তার কাহিনী শেষ করলেন।
একটা হাসিমাখা মানুষ এতো কষ্টে আছেন। আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। কিন্তু কোনো সমাধান জানা ছিল না।
হঠাৎ পাখির ডাক বাড়তে থাকায় জানালার পর্দা তুলে দেখি ভোর হয়ে গেছে।
খুবই সুন্দর শাড়ি পরে পরদিন অফিস প্রেজেন্টেশন করেছি।
আমার আর আপার মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া।
অদ্ভুত সম্পর্ক।
এখন এক খাটে শুই।
আড়ালে কে কি বললো জানি না।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
কক্সবাজার থেকে

শিফন রাজনীতি

– ম আ হান্নান

২ মে ২০০২–এ বাংলাদেশের পৃন্ট মিডিয়া জগতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আগের দিন সরকারি ছুটি থাকায় এদিন সমস্ত দৈনিক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি মাত্র বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট দৈনিক *নিরপেক্ষকণ্ঠ* নামে এ পত্রিকাটি এ দেশে খুবই জনপ্রিয়(?)। এবিএম মুনতাসীর গাফফার নামে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী *শিফন উৎপাদন, পরিধান, বিপণন ও প্রদর্শন* শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এ দিনের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলামে ব্যাপী ব্যানার হেডে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপে বাংলার ঘরে ঘরে, অফিস আদালতে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌছে যায় :
গত সপ্তাহে মন্ত্রী পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের সকল মহিলাদের জন্য শিফন শাড়ি পরিধান বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব পেশ করেন বস্ত্রমন্ত্রী। তাকে সমর্থন করেন মহিলা বিষয়কমন্ত্রী। এ লক্ষ্যে সকল সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত শাড়ি উৎপাদনকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে শুধু এক কালার শিফন শাড়ি উৎপাদন, বিক্রয় ও প্রদর্শনের নির্দেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এ আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়ার আশ্বাস দেন। তিনি প্রয়োজনে পুলিশের

পাশাপাশি বিডিআর ও সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হবে বলে জানান। এ আইন অমান্যকারীদের জন্য সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ ছয় বছর কারাদণ্ড ও পাচশ থেকে পাচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানা যায়। বৈঠকে সভাপতিত্বে করেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এ সময় তার পরনে ছিল একটি হালকা গোলাপি শিফন শাড়ি। সংসদের আগামী অধিবেশনে এ বিলটি উত্থাপন এবং তা পাস করা হবে।

অতঃপর মহাবিস্ফোরণ। পরদিন থেকে রিপোর্টিং পত্রিকাসহ আরো কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। দেশি বিদেশি সাংবাদিক, বিবৃতিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তাদের টার্গেট ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যধর্মী প্রতিবেদন, বিবৃতি ও মহামূল্যবান মন্তব্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা, প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

ঘটনার আড়ালে

এরূপ একটি কালো আইন কেন করা হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট কলামিস্ট আবেদ আলী একপেশে টিভিতে *ঘটনার আড়ালে* নামক একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন সুন্দরী মহিলা। তিনি সব সময় শিফন শাড়ি পরিধান করে থাকেন। তার ধারণা, শিফন শাড়িতে সবাইকে তার মতো সুন্দর লাগবে। তাছাড়া সবাই যখন শিফন শাড়ি পরবেন তখন সচেতনভাবে না হলেও অচেতন মনে তারা প্রধানমন্ত্রীর ভক্ত বা অনুসারী হবেন বলে হয়তো বর্তমান সরকার ধারণা করেছে। কিন্তু জোর করে, আইন করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া কি গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী নয়? অধিকন্তু এটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করার একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।

নেপথ্য কাহিনী

এরূপ আইন প্রস্তাবের নেপথ্যে কি থাকতে পারে? বারটিল লিন্টন নামের একজন পশ্চিমা শিক্ষাবিদ, পর্যটক সাংবাদিক পরিচয়ে এ প্রশ্নের জবাবে *ফার ইস্ট জার্নাল*–এ বলেন, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের তাত শিল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে যে, ওই সমস্ত এলাকার সবাই শিফন শাড়ি পরিধান করেন। ফলে এসব এলাকায় সমস্ত আসনেই বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট জয়লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও কুষ্টিয়ার নাম বলেছেন। এই ঘটনা থেকে তারা উৎসাহিত হয়েছেন। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগেও পণ্যের বহুমুখী উৎপাদন ও বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা দেশকে ড্যান্ডিমুখী করতে চান। এমনকি হিন্দু বিধবা নারীদেরকেও আইন পাসের আগেই বাধ্য করা হচ্ছে রঙিন শিফন শাড়ি পরতে। এমনকি বিদেশিরাও এখন তাদের চিরাচরিত পোশাক ছেড়ে শিফন শাড়ি পরতে বাধ্য হচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি উক্ত জার্নালে রঙিন শিফন শাড়ি পরিহিত কিছু হিন্দু মহিলার ছবি প্রকাশ করেন।

এ রিপোর্ট ও ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর সাপ্তাহিক *সজীব দিনের* একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা যায়, একই ছবি এ দেশের একটি জাতীয় পত্রিকায় এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল *বাংলা নববর্ষে এক দল উচ্ছল প্রাণবন্ত তরুণী* ক্যাপশনে। এদিকে বারটিল লিটন–এর প্রতিবেদনকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স তথ্য ভিত্তিক নয় ও অতিরঞ্জিত বলে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছেন। তিনিও এ

দেশে এখনো হাফপ্যান্ট পরে স্বচ্ছন্দে বেড়ান বলে জানিয়েছেন। সচেতন নারী সমাজের উদ্যোগে একটা প্রেস কনফারেন্সে বিশিষ্ট আইনজীবী সাহারা হালিম বলেন, সরকার নারীর মৌলিক অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র করছে। আমরা এর বিরুদ্ধে *নারীর অধিকার মানবাধিকার* শীর্ষক কনভেনশন করবো। তিনি এ ব্যাপারে সিনেটর হিলারি ক্লিনটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এদিকে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*–এর পক্ষ থেকে সিনেটর হিলারির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান। ড. ইউনূস তাকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে তার গ্রামীণ চেকের শাড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন, বিক্রয় বা প্রদর্শনীর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি।

লন্ডনে অবস্থানরত প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে *বিবিসি* ও *চ্যানেল ফোর*–এর সাংবাদিকরা সম্ভাব্য আইন সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলা নববর্ষে প্রধানমন্ত্রী আমাকে কিছু মরসুমি ফল, ফুলের তোড়া ও শিফন শাড়িসহ একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। আমি সবই গ্রহণ করেছি। কিন্তু শাড়ি ফেরত পাঠিয়েছি। কারণ শিফন অত্যন্ত পাতলা শাড়ি। কোনো ভদ্রঘরের মহিলা কি শিফন শাড়ি পরে? তিনি বিধবা মহিলা হয়ে কেন এ শাড়ি পরেন আমি বুঝি না। হয়তো আমাকে পরতে বাধ্য করার জন্য তিনি এ আইনটা করতে চান।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কদিন ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হলেও সরকার এ ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব থাকে। এক পর্যায়ে হাই কোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সুয়োমটো রুল জারি করে। অবশেষে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় যে, *শিফন উৎপাদন, পরিধান, বিপণন ও প্রদর্শন* নামে কোনো আইন নিয়ে মন্ত্রী পরিষদে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি এবং কোনো আইন করার চিন্তা ভাবনাও সরকার করছে না। তবে মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ বৈঠকে গত সিটি কর্পারেশন নির্বাচনে ঢাকার একটি ওয়ার্ড থেকে নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার মণি বেগম বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে, গত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় যে সমস্ত পুলিশ তার পরনের শাড়ি টেনে খুলে ফেলেছিল তাদের বিচার হবে কি না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, পুলিশসহ এর পেছনে যারা জড়িত সবাইকে বিচারের কাঠ গড়ায় দাড় করানো হবে। সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কয়েকটি হালকা রঙয়ের শিফন শাড়ি মণি বেগমকে উপহার দেয়া হয়। মণি বেগম অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন, অপরাধীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি শিফন ছাড়া অন্য শাড়ি পরবেন না, কিনবেন না, এমনকি সংরক্ষণও করবেন না।

সুতরাং চায়ের কাপে ঝড় তোলার মতো কোনো উপাদান এতে ছিল না, এখনো নেই। এটা পত্রিকাওয়ালাদের হলুদ সাংবাদিকতা। অন্য পেশাজীবীদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি অনৈতিক পক্ষপাতিত্ব। সর্বোপরি রাজনীতিবিদদের নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অনৈতিক প্রচেষ্টা।

কৃষ্ণদিয়ার, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ থেকে